বাংলাদেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চালচিত্র : কোথায় যেতে হবে, কোথায় যাচ্ছি?[১]

ড. আবুল বারকাত

সারকথা: এক আত্মঘাতী লুণ্ঠন প্রক্রিয়া বাংলাদেশের অর্থনীতির নিয়ামক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদে (trap of economic criminalization) পড়েছে অর্থনীতি। অর্থনীতির দুর্বৃত্তায়ন সমাজ, রাজনীতি আর রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেও দুর্বৃত্তায়িত করেছে। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের কার্যকরী চাহিদা (effective demand for criminalization of politics) বৃদ্ধি করেছে; আর ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদকে করছে আরও শক্তিশালী। আর্থ-রাজনৈতিক-সামাজিক দুর্বৃত্তায়ন থেকে জনকল্যাণমুখী উত্তরণে রাজনৈতিক পরিবর্তন জরুরি। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে উষ্ণহৃদয় অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন গভীর মানবিক গুণাবলী সমৃদ্ধ সাহসী দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব ও জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ (insightful courageous patriotic leadership accomplished with high humane values and substantive public actions) নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে নির্মোহ সত্যানুসন্ধানের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার আর উদঘাটিত সত্য গ্রহণে সক্ষম মানসিক কাঠামো সৃষ্টির বিকল্প নেই ।

প্রবন্ধের উদ্দেশ্য

১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের স্বাধীনতা চেতনার সারবস্তু যা ছিল তা সামনে রেখে এ প্রবন্ধে গত তিন দশকের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিকাশের একটি ব্যালান্স-শিট প্রণয়নের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে ঐ ব্যালান্স-শিট থেকে কাঙ্ক্ষিত সামাজিক কল্যাণের পথনির্দেশ করার। এখানে যে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক হালচাল বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তা বর্তমান অবস্থার নির্দেশক। তবে তা তাৎক্ষণিক বর্তমান নয়, গত তিন দশকের বিকাশ ধারার যোগফল বা ঘনীভূত প্রকাশ মাত্র। এ সময়ের মূল নির্দেশকগুলি আমাদের রাজনীতি অর্থনীতির ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণে সহায়ক হবে। এ প্রয়াস পদ্ধতিগতভাবে বিধিসম্মত হবার কথা।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার বয়স তিন দশকের অধিক। দুই অর্থনীতির বৈষম্যের যাঁতাকলে পিষ্ট মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছিল। এ দেশের মানুষ স্বপ্ন দেখেছিলেন জনকল্যাণমুখী একটি রাষ্ট্রের—যে রাষ্ট্রে নিশ্চিত হবে চয়নের স্বাধীনতা (freedom of choice), অবারিত হবে অর্থনৈতিক সুযোগ, উন্মেষিত হবে সামাজিক সুবিধাদি, পাওয়া যাবে রাজনৈতিক মুক্তি, থাকবে স্বচ্ছতা ও সুরক্ষার নিশ্চয়তা। স্বাধীন রাষ্ট্রের সংবিধান এসবের অঙ্গীকার করে, প্রকাশ্যে। করে মৌলিক চাহিদা মেটানো থেকে শুরু করে নারী-পুরুষ-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমানাধিকারের অঙ্গীকারও।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: বিষয়বস্তুর বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা হয়েছে। তাদের সবার প্রতি নিবন্ধকার কৃতজ্ঞ। বিভিন্ন সময়ে চিন্তা-উদ্রেগকারী প্রশ্ন উত্থাপন করে যারা নিবন্ধকারকে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেছেন, তাদের মধ্যে আছেন ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমেদ, সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি; ড. মইনুল ইসলাম, প্রাক্তন সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি; ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, প্রধান, সমাজ-রূপান্তর অধ্যয়ন কেন্দ্র; ড. সায়ীদুল হক খান, অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. শফিক-উজ-জামান, অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. অভিজিৎ পোদ্দার, জনমিতি গবেষক; ড. জামাল উদ্দিন, হিসাব বিজ্ঞানী ও বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য; জনাব আয়ুব আলি, শ্রমিক নেতা; ডা. এ কে এম মুনীর, বিশিষ্ট চিকিৎসক; ড. শশাঙ্ক দাস গুপ্ত ও জনাব এ কে এম মাকসুদ, সমাজ বিজ্ঞানী; জনাব নূর আহমেদ, প্রাক্তন ছাত্র নেতা; জনাব মাহমুদ জামাল কাদেরী, উপদেষ্টা, সম্মিলিত রিকসা-ভ্যান চালক-মালিক পরিষদ, এবং ড. সাইফুল হক, সমাজ-সচেতন ব্যবসায়ী। সম্পাদনায় সহযোগিতার জন্য বিশিষ্ট সাহিত্যিক-সাংবাদিক অরুণাভ সরকারের প্রতি প্রবন্ধকার সবিশেষ কৃতজ্ঞ। প্রবন্ধটি কয়েক দফা টাইপ করার জন্য মানব উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (এইচ ডি আর সি) জনাব মোজাম্মেল হকের কাছে প্রবন্ধকার দায়বদ্ধ।

[১] বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত 'বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক চালচিত্র' শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে পঠিত, ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা, ১৯ পৌষ ১৪০৯/০২ জানুয়ারী ২০০৩ (বর্তমান প্রবন্ধটি পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত)

রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মানদণ্ডের নিরিখে গত তিন দশকে অর্জন বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এ প্রবন্ধে সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণের একটা প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্র ও খাতের বিকাশকে তুলনা করা হয়েছে স্বাধীনতাকামী মানুষের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে। অনুসন্ধান করা হয়েছে আমাদের কোথায় যেতে হবে আর আমরা কোথায় যাচ্ছি– এ দু'য়ের ফারাক। বুঝতে চেষ্টা করা হয়েছে, যা ঘটেছে তা কেন ঘটলো। গত তিন দশকে যে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক রূপান্তর ঘটেছে, তা, কোন প্রবণতা নির্দেশ করে? বিষয়টির বিশ্লেষণ আমাদের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ নিরূপণ ও অগ্রযাত্রায় সহায়ক হতে পারে।

তিন দশকে সৃষ্ট রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামো : মূল প্রবণতা মানব কল্যাণ বিমুখ

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সামন্তবাদী উৎপাদন সম্পর্ক ক্ষয় হয়েছে, কিন্তু চিরাচরিত পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক বিকশিত হয়নি; বিকশিত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের নিকৃষ্ট পুঁজি, যা উৎপাদনশীল বিনিয়োগে ভূমিকা রাখে না। একচেটিয়া পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের মুক্তবাজার এদেশের জাতীয় পুঁজি-ভিত্তিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার পথে এক প্রতিবন্ধক। গত তিন দশকে এদেশে (মোট ও মাথাপিছু) জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে; সরকারি হিসেবে কমেছে দারিদ্রের আপাতন; বেড়েছে শিক্ষা আর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার; শিশু মৃত্যুর হার কমেছে; বেড়েছে টিকাপ্রাপ্ত শিশু আর পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণকারী দম্পতির সংখ্যা; মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও সচলতা (ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে) বৃদ্ধি পেয়েছে; বৃদ্ধি পেয়েছে গড় আয়ু। এসব বিষয়ে আমার দ্বিমত নেই, আপত্তি আছে এসব নিয়ে গুণকীর্তনে। কারণ এগুলোর অধিকাংশের সঙ্গে সরকারি সচেতন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের তেমন কোনো সম্পর্ক নেই; এগুলোর অধিকাংশই সময়ের ব্যাপ্তিতে অতি সাধারণ প্রক্রিয়া মাত্র; আর এগুলোর কোনোটিই কার্যকারণগতভাবে অর্থনৈতিক বিকাশের মূল প্রবণতার সূচক নয়।

কাঠামোগত রূপান্তরের নিরিখে গত তিন দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এমন কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি যা দিয়ে বলা যাবে যে, স্বাধীনতার মানবকল্যাণমুখী চেতনা বাস্তবায়িত হয়েছে। সুস্থ-সবল-চেতনাসমৃদ্ধ ভেদ-হীন মানুষ সৃষ্টিই ছিল স্বাধীনতার মূল আকাঙ্ক্ষা। সে আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতার দূরত্ব ব্যাপক ও ক্রমবর্ধমান। আমাদের সংবিধানের ১৫নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত 'মৌলিক চাহিদা' মিটিয়ে গোটা জাতিকে দারিদ্রমুক্ত করতে লাগবে ৩১০ বছর, আর গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচনে সময় লাগবে ৯০৯ বছর। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার ভেতর আর যা-ই থাক, গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচনে এক হাজার বছরের কর্মসূচির কথা ছিল না। প্রশ্নাতিত প্রশ্ন– সমস্যাটি কোথায়? নিশ্চয়ই স্বাধীনতার পরবর্তী ৩০ বছরের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বড় মাপের এমন কোনো গলদ ছিল যা এদেশে মানব কল্যাণ নিশ্চিত করতে দেয়নি। নিশ্চিত করেনি কৃষির উন্নয়ন ও দ্রুত শিল্পায়নের ভিত্তি। কাঠামোগত রূপান্তর যা ঘটেছে, তা মানবকল্যাণবিমুখ।

ফাঁদে পড়েছে স্বাধীনতা। ফাঁদে পড়েছে পবিত্র সংবিধান। ফাঁদে পড়েছে বাংলাদেশ। দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদ। রাজনীতি-অর্থনীতির মারপ্যাচে সৃষ্টি হয়েছে চরম বৈষম্যমূলক দুই অর্থনীতি, দুই সমাজ।

দুই অর্থনীতির বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে– এ কথা সত্য। তবে গত ৩০ বছরের বিকাশের ধারা ১৪ কোটি[২] মানুষের আমাদের দেশকে সম্ভবত সুস্পষ্টভাবে দু'ভাগে বিভাজিত করেছে। এর

- প্রথম ভাগে আছেন সংখ্যালঘু ক্ষমতাধর মানুষ, যাদের সংখ্যা হবে বড়জোর ১০ লাখ; আর
- দ্বিতীয় ভাগে আছেন সংখ্যাগুরু ক্ষমতাহীন মানুষ, যাদের সংখ্যা হবে ১৩ কোটি ৯০ লাখ।

---

[২] ২০০১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ২২ জানুয়ারী ২০০১-এ বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১২ কোটি ৯৩ লাখ (দেখুন, Population Census 2001, Preliminary Report, BBS 2001:4)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার ১.৬ শতাংশ হলে ২০০৪-এর জানুয়ারীতে বাংলাদেশের জনসংখ্যা হবে ১৩ কোটি ৫৬ লাখ। লেখার সুবিধার জন্য আমরা ১৪ কোটি বলছি।

সুতরাং রাজনীতি-অর্থনীতির মারপ্যাচে সৃষ্টি হয়েছে এমন এক অবস্থা যেখানে ১০ লাখ ক্ষমতাধরের বিপরীতে আছেন ১৩ কোটি ৯০ লাখ ক্ষমতাহীন, অসহায়, দুর্দশাগ্রস্ত বঞ্চিত মানুষ। প্রকৃত অর্থে এই বিশাল সংখ্যক ক্ষমতাহীন মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি অথবা ক্ষমতাহীনদের ক্ষমতায়ন অথবা বহিস্থকে অন্তর্ভুক্তিকরণ (inclusion of the excluded)—এ বিষয়ে অন্তত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক-সামাজিক কর্মকাণ্ডের নিরিখে সচেতন কোনো প্রয়াস কখনও নেওয়া হয়নি (পরিকল্পনা দলিল দস্তাবেজে যাই থাক না কেন)। সে ধরণের প্রয়াস বাস্তবায়নের রাজনৈতিক কাঠামোটিও কখনও ছিল না। উল্টো, ক্ষমতাবানদের ক্ষমতা বৃদ্ধির বহুমুখী প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে, তা আরও বহুদিন বহাল থাকবে। সামগ্রিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমীকরণ তা-ই নির্দেশ করে।

সরকারে (নির্বাচিত-অনির্বাচিত নির্বিশেষে) যারাই ছিলেন বা রয়েছেন, সকলেই প্রমাণ করতে সচেষ্ট যে, উন্নয়নই ছিল তাদের প্রধান লক্ষ্য। তারা দাবি করেন তারা দারিদ্র বিমোচন করেছেন আগের তুলনায় অনেক বেশি। দাবিটি মিথ্যা ও প্রতারণামূলক। 'উন্নয়ন' হয়েছে, তবে তা সংখ্যাগরিষ্ঠের নয়, লাখ দশেক ক্ষমতাধরের। অর্থাৎ যে 'উন্নয়ন' হয়েছে তা সাধারণ মানুষের নয়। excluded-রা সব সময় excluded-ই রয়ে গেছেন। আর ক্ষমতাধরদের আর্থ-সামাজিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ঠতার কারণেই excluded-দের উন্নয়নের মূল ধারায় include করার প্রয়াস বৈরী অন্তর্ভুক্তিকরণ (adverse inclusion)-এ রূপান্তরিত হয়েছে। দেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধান। সংবিধানের ৮ থেকে ৪৩ পর্যন্ত অনুচ্ছেদে 'রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি' ও 'মৌলিক অধিকার' তুলে ধরা হয়েছে। সে অধিকার থেকে বঞ্চিতরাই দরিদ্র। এ হিসেবে বাংলাদেশের শতকরা ৯৫ ভাগ মানুষকেই দরিদ্র[৩] বলা যায়। অর্থাৎ সংবিধানকে দারিদ্র পরিমাপণের ভিত্তি হিসেবে ধরলে দেখা যায় যে, প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক যে জনগণ (অনুচ্ছেদ ৭.১), তাদের ৯৫ ভাগ দারিদ্র সীমার নিচে পড়ে রয়েছে, কারণ :

এক. আয়ের অথবা খাদ্য গ্রহণের নিরিখে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ৬-৭ কোটি; মৌলিক চাহিদার মূল্যমানের নিরিখে সে সংখ্যা ৮-১০ কোটি (এ অবস্থা সংবিধানের ১৪ ও ১৫ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী)। ক্রমবর্ধমান ধনবৈষম্যের কথা তো সরকারিবিভাবেই স্বীকৃত– মাত্র ৫% ধনী পরিবার দেশের মোট পারিবারিক আয়ের ৩০% দখল করে আছে (অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৩)। আসলে কালো টাকা যোগ করলে ৫% ধনীর দখলে হবে কমপক্ষে ৫০% আয়। জাতীয় সম্পদ ও জাতীয় আয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠির তুলনামূলক হিস্যা ক্রমহ্রাসমান।

দুই. প্রায় ৩ কোটি মানুষ পুরোপুরি গৃহহীন আর কোনো মতে মাথা গোজার আবাসন আছে ৬ কোটি মানুষের। অর্থাৎ ৯ কোটি মানুষের হয় একদমই কোনো আবাসন সুবিধা নেই অথবা যা আছে তাকে আবাসন সুবিধা বলা যাবে না। (যা সংবিধানের ১৫-ক অনুচ্ছেদের পরিপন্থি)।

তিন. সাক্ষর-নিরক্ষর মিলে প্রায় তিন কোটি মানুষ (যাদের অধিকাংশই যুবক) এখনও বেকার। (সংবিধানের ১৫খ ও ২০ অনুচ্ছেদ কর্মের অধিকার নিশ্চিত করে) প্রতিবছর শ্রম বাজারে যে ৩০ লাখ মানুষ সংযোজিত হয় তার মধ্যে ২২ লাখ মানুষ কোনো কাজ পায়না। স্ফীত হচ্ছে অনানুষ্ঠানিক সেক্টর ও সংশ্লিষ্ট দারিদ্র।

চার. প্রায় নয় কোটি মানুষ প্রাথমিক স্বাস্থ্য-সেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত (যা সংবিধানের ১৮ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী)।

[৩] বিস্তারিত দেখুন, বারকাত আবুল, 'বাংলাদেশে দারিদ্র উচ্ছেদ ও দারিদ্র্যহ্রাস : উদ্বেগের বিষয়' বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত 'বাংলাদেশের দারিদ্রাবস্থা ও দারিদ্র্যহ্রাস কৌশলপত্র' শীর্ষক জাতীয় সেমিনার, ঢাকা : ৫ নভেম্বর ২০০২।

পাঁচ. সারা দেশে প্রতিবছর ছয় লাখ মানুষের মৃত্যু। এর অর্ধেকই পাঁচ বা তারও কম বয়সের শিশু। আরও দুঃখের কথা, ৫০% ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ দারিদ্র। নিউমোনিয়ার চিকিৎসায় মাথাপিছু ব্যয় মাত্র ১৩ টাকা, ডায়ারিয়ার ১৭ টাকা, হামের ১২ টাকা এবং যক্ষ্মার ৯০০ টাকা। (যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে আমাদের অবস্থান চতুর্থ শীর্ষে)। সে চিকিৎসাও এদের জোটে না। (সংবিধানের ১৫ ও ১৮.১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অবস্থা এমন হবার কথা নয়)।

ছয়. প্রায় আট কোটি মানুষ এখনও কার্যত নিরক্ষর এবং প্রকৃত শিক্ষা-সুযোগ বঞ্চিত এবং সার্বজনীন গণমুখী মানসম্মত শিক্ষা বলতে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই (যা সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদ, বিশেষত ১৭গ অনুচ্ছেদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী)।

সাত. প্রায় এগার কোটি মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা বঞ্চিত এখনও (অথচ সংবিধানের ১৬ ধারা এ সুবিধা নিশ্চিত করে)।

আট. সীমিত আয়ের বিপুল সংখ্যক মানুষ প্রকৃত অর্থেই দুর্দশাগ্রস্ত। বেকারত্ব এবং দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ছে বলে সে দুর্দশাও বাড়ছেই। ইদানিং মোটা চালের দাম বেড়েছে কেজি প্রতি ৫-৬ টাকা, মসুরি ডাল ৮-১০ টাকা এবং সয়াবিন তেল ১০ টাকা করে। খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জিত হলেও দরিদ্র মানুষের খাদ্য-পরিভোগ বাড়েনি। প্রায় ২৫-৩০ লাখ টন উদ্বৃত্ত চাল আছে, অথচ সরকারি হিসেবে খাদ্য পরিভোগ-নিরিখে ৪৪% মানুষ দরিদ্র। অবস্থা এমনই যে খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেলেও নিরন্ন-মঙ্গাক্লিষ্ট মানুষের সংখ্যা দ্বিগুণ বাড়তে পারে। কারণ বাজার অন্ধত্বের আওতায় বণ্টন-অসমতা ক্রমবর্ধমান (এসবই সংবিধানের ১৩, ১৫ ও ১৯ অনুচ্ছেদে-র সঙ্গে সাযুজ্যহীন)।

নয়. দেশের অধিকাংশ নারী, শিশু ও প্রবীণ নিশ্চিতভাবেই বঞ্চিত (যা সংবিধানের ১০, ১১, ১৫, ১৭, ১৮ ও ২৮ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী)।

দশ. বিরাট এক জনগোষ্ঠি ক্রমশ বেশি মাত্রায় নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ছেন। খুন, ধর্ষণ, মাস্তানি-রাহাজানি ভূমি-বন-জল-দস্যুবৃত্তি (দেশে এক কোটি বিঘা খাস জমি ও জলাশয় নিয়ে) এবং মহিলা ও শিশুদের প্রতি সকল ধরণের নির্যাতনসহ প্রকৃত দেশপ্রেমিক সত্যভাষি সাংবাদিক, শিক্ষক, রাজনীতিবিদসহ সকল দেশের মানুষের নিরাপত্তাহীনতার সকল কারণই বাড়ছে। কমছে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক নিরাপত্তা (এসবই রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ও মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত সকল ধারার পরিপন্থী)।

এগার. ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু এবং আদিবাসী মানুষের বঞ্চনা চিরস্থায়ী করেছে। শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনের মারপ্যাচে ইতোমধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের ৫০ লাখ মানুষের ২০ লাখ একর ভূ-সম্পত্তি জবরদখল করা হয়েছে (এর বাজার মূল্য এক লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা)। জবরদখলকারীরা আমাদের জনসংখ্যার মাত্র ০.৪ শতাংশ (ক্ষমতাধর গোষ্ঠিভুক্ত)। আর ক্ষুদ্র জাতিসত্তার আদিবাসীরা কি অর্থনীতি, কি শিক্ষা, কি স্বাস্থ্য— সবদিক থেকেই প্রান্তস্থ (এসব কিছুই সংবিধানের ২৭, ২৮, ও ৪১ অনুচ্ছেদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী)।

এসব বঞ্চনা থেকে মুক্তির নামই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মুক্তি। এক্ষেত্রে গত তিন দশকের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসকে মানব কল্যাণে ব্যর্থতার ইতিহাস বললে বিশেষ ভুল হবে না। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত কোনো প্রক্ষেপণই সম্ভবত সে মুক্তির বা সুস্থ-সুন্দর ভবিষ্যতের আভাস দেয় না।

সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষমতাহীন মানুষ (কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার সূচক-সংক্রান্ত সরকারি পরিসংখ্যান যা-ই বলুক না কেন) অতিকষ্টে জীবন যাপন করছেন, এ বিষয়ে কোনোও সন্দেহ নেই। একই সময়ে অর্থনীতি, রাজনীতি, আর শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রসহ সর্বত্র এক আত্মঘাতী লুণ্ঠন সংস্কৃতি (culture of plundering) জেঁকে

বসেছে। এই লুণ্ঠন সংস্কৃতির চরিত্র-নিয়ামক হ'ল কালো টাকা, সন্ত্রাস, অবৈধ অস্ত্র, পেশি শক্তি, ঘুষ, দুর্নীতি, কুশাসন-অপশাসন, দমন-পীড়ন ইত্যাদি। আমরা জানি, পুঁজিবাদ বিকাশে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে লুণ্ঠন; কিন্তু এ দেশে লুণ্ঠন প্রক্রিয়া জাতীয় পুঁজি বিকাশে ব্যর্থ হয়েছে তা না হলে বিশ্বের সর্ববৃহৎ পাটকল আদমজি বন্ধ হবে কেন? কেন বন্ধ হবে দেশজ কাঁচা মাল নির্ভর ব্যক্তিখাতের কল-কারখানাও? কেন সকল ধরনের উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ড অনুৎসাহিত হবে?

সামাজিক-রাজনৈতিক গণমুখী রূপান্তর বাদ দিয়ে ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণে আশাবাদ ব্যক্ত করা কঠিন, তা স্বাধীনতাত্তোর অর্থনীতির হরিলুট সংস্কৃতির কয়েকটি দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে সহজেই বোঝা সম্ভব। বাংলাদেশের অর্থনীতি আসলে এক গভীর 'দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদে' (criminalization trap) পড়েছে। এ অবস্থায় শিল্পায়ন তথা উন্নয়নের সম্ভাবনা যে ক্ষীণ, তা দুর্বৃত্তায়নের নিম্ন বর্ণিত কয়েকটি স্বরূপ বিশ্লেষণ করলেই ধরা পড়বে:

এক. অর্থনীতির দুর্বৃত্তায়ন (criminalization of economy) হয়েছে। অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদ রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের[4] (criminalization of politics) কার্যকরী চাহিদা (effective demand) বৃদ্ধি করে। আবার প্রথমটিকে বাধাহীন করে দ্বিতীয়টি। দুর্বৃত্তায়নের এ ফাঁদ উন্নয়নের প্রতিবন্ধক। দুর্বৃত্তায়নের এ ফাঁদ সর্বত্র এক আত্মঘাতী লুণ্ঠন সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছে।

দুই. গত তিন দশকে সরকারিভাবে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য এসেছে এক লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকার। এর ৭৫% লুণ্ঠন করেছে অর্থনীতি-রাজনীতির দুর্বৃত্ত গোষ্ঠি। ফলে ক্ষমতাহীনদের অক্ষমতা বাড়ে আর ক্ষমতাধরদের বাড়ে ক্ষমতা ও নিকৃষ্ট পুঁজি।

তিন. ক্ষমতাবানরা কমিশন বা দুর্নীতি লব্ধ নিকৃষ্ট পুঁজির (ব্রিফকেস পুঁজি) মালিক, উৎপাদনশীল বিনিয়োগে তার কোনো ভূমিকাই নেই। তা দিয়ে প্রকৃত শিল্পায়ন বা উন্নয়ন অসম্ভব।

চার. এরা কালো অর্থনীতির একটা বলয় সৃষ্টি করেছে। যে দুষ্টচক্রে বছরে ৭০ হাজার কোটি কালো টাকার (জাতীয় আয়ের এক-তৃতীয়াংশের সমান) সৃষ্টি করে এরা। এরাই আবার ৩০-৪০ হাজার কোটি টাকার ঋণখেলাপি (লুণ্ঠন সংস্কৃতিতে যুক্ত হয়েছে ঋণখেলাপি সংস্কৃতি)। এরাই বছরে ১৫ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতিতে জড়িত; এরাই বছরে কমপক্ষে ৩৪ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার (money laundering) করে। এরাই বছরে ১০ হাজার কোটি টাকার বিদ্যুৎ ও ৫ হাজার কোটি টাকার গ্যাস চুরির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এরাই রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কিনে নিতে আগ্রহী (তবে তা শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে নয়); এরাই অর্থনীতির স্থবিরতার জন্য দায়ী। এরাই আবার রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকে এবং/অথবা তাকে ব্যবহার করে সরকারকেও ঋণখেলাপি বানায়। এরাই রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে অপচয় এবং বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক বিকৃতি ঘটায়। এসব কর্মকাণ্ড উন্নয়ন বিরোধী।

[4] রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের বহিঃপ্রকাশ বহুমুখী। প্রত্যেক সরকার তার পূর্ববর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, সাংসদ ও সংশ্লিষ্ট রাজনীতিবিদ, আমলা ও ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে অসংখ্য দুর্নীতির মামলা করেন (অবশ্য শেষ পর্যন্ত প্রকৃত দুর্বৃত্তের কিছুই হয় না); দল পরিচালনে প্রত্যেক বৃহৎ রাজনৈতিক দল প্রকৃত দুর্বৃত্তেদের উপর নির্ভর করেন, আর দুর্বৃত্তরা অধিকহারে দুর্বৃত্তায়নের সুযোগ পায়; তারা জনগণের রায় প্রার্থনা করেন এবং নির্বাচনের ইস্তেহার-বক্তৃতা-বিবৃতিতে দুনিয়ার সবকিছু দেবার প্রতিশ্রুতি দেন অথচ নির্বাচন পেরুলে সবই বেমালুম ভুলে যান; প্রত্যেকেই ক্ষমতায় গেলে জনগণের সুবিধার্থে রাস্তাঘাট-স্কুল-কলেজ থেকে যা কিছু নির্মাণ করেন তা যতটা না জনগণ উদ্দিষ্ট তার চেয়ে বেশি নিজেদের মধ্যে অধিকহারে কমিশন-বখরা বাটোয়ারার লক্ষ্যে। রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে উচ্ছিষ্টভোগী এসব দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতিক। নিকৃষ্ট পুঁজির বাহক অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের এ গোষ্ঠি উত্তরোত্তর অধিক হারে জাতীয় সংসদও দখল করেছেন-- যেমন, ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের সংখ্যা ১৯৫৪ সালের সংসদে ছিল মোট সাংসদের মাত্র ৪ শতাংশ, ১৯৭৩ সালে ২৪ শতাংশ, আর ১৯৯১ সালে ৬০ শতাংশ; গত ১০ বছর এ ধারা অব্যাহত আছে (রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ড. তালুকদার মনিরুজ্জামান ও ড. রওনক জাহানের গবেষণা দ্রষ্টব্য)। ঘুষ, চাপ, ভয়-ভীতি, নির্যাতন, প্রলোভন এখন ক্ষমতার রাজনীতিতে অন্যতম প্রভাবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতিতে যারা ক্ষমতা প্রদর্শন করছেন তাদের প্রতি মানুষের আত্মার গভীরে অনাস্থা বেড়েছে (যা প্রকাশ হচ্ছে না)। মানুষের সামনে এখন আর রাজনৈতিক 'Role Model' বলে কিছু নেই। এ প্রবণতাকে গভীর ভাবনার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।

পাঁচ. দুর্বৃত্ত-বেষ্টিত সরকার তার বিনিয়োগ সিদ্ধান্তে সাধারণ মানুষের কথা তেমন গুরুত্ব পায় না। গুরুত্ব পায় লুণ্ঠনের নানা খাত। যে টাকায় বাংলাদেশকে পুরোপুরি যক্ষা ও কুষ্ঠরোগ মুক্ত করা সম্ভব, তা দিয়ে কেনা হয় যুদ্ধবিমান! বাজেট ঘাটতি হবে, অথচ অনুৎপাদনশীল ব্যয় হবে উদ্বৃত্ত। এ সব কোন্ ধরণের মানব-হিতৈষী বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত? এ ধরনের বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত মানব উন্নয়ন বিমুখ।

ছয়. ক্ষমতাবান দুর্বৃত্তদের স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতিও গড়ে উঠেছে। তা সম্পূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জাতীয় পুঁজির প্রতিকূল বলে—

- কোনও বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা নেই,
- নির্বাচন মানেই কালোটাকার প্রতিযোগিতা (গত জাতীয় নির্বাচনে নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট মোট ব্যয় প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা),
- সন্ত্রাস-সহিংসতা অনিবার্য ও নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা (অনেকেই মনে করেন এদেশে ৭-৮ লাখ অবৈধ অস্ত্র আছে),
- মানুষ হত্যা নিয়ে সাময়িক হৈ চৈ-এর পরে পরবর্তী হত্যাকাণ্ডের ভিড়ে আগেরটি হারিয়ে যায়,
- সরকারি গণমাধ্যম মানেই স্তুতি প্রচারের যন্ত্র,
- মানব-মুখী সকল মাধ্যম দ্রুত বন্ধ করা হয়,
- জনগণের অংশগ্রহণের কথা নেহায়েতই টোকেনইজম (স্লোগান),
- সুশাসন শব্দটি অতিমাত্রায় উচ্চারিত কিন্তু একেবারেই মূল্যহীন,
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নেহায়েতই কাগুজেশব্দ,
- জনগণের কাছে দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠান বলতে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই,
- মানুষের দুর্দশা-বঞ্চনা কেন্দ্রিক ব্যবসা সবচে' লাভজনক,
- বিচারের রায় প্রভাবান্বিত হয়,
- ক্ষমতাসীনরাও স্বীকার করেন যে, রাষ্ট্র পর্যন্ত সন্ত্রাসে মদত দিতে বাধ্য,
- জনগণের রায় থাক বা না থাক, ক্ষমতাধরদের গণতন্ত্র, অথবা গণতন্ত্র ও বাহিনী শাসনের সংমিশ্রণ, অথবা স্বৈরতন্ত্র– যে-কোনোটিই চলতে পারে,
- উগ্র জাতিয়তাবাদের সাথে অস্ত্র ও ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা একাকার হয়ে পরিপুষ্ট হয়,
- মানব হত্যার দায়মুক্তি দর্শনও স্বাভাবিক বলে চালিয়ে দেয়া হয়।

আর এসবই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ দেশে ব্যাপক জনগোষ্ঠির সুপ্ত সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশের শর্তাদি বিনষ্ট করছে; মানুষকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রতিকূলে কাজ করছে; দালাল-পুঁজির বিকাশ ত্বরান্বিত করছে যে পুঁজি উৎপাদনশীল খাতে নয় অনুৎপাদনশীল খাতের বিকাশে অতি উৎসাহী; সরকারি-বেসরকারি খাতে জাতীয় সম্পদের বিপুল অপচয়ের কারণ হিসেবে কাজ করছে; প্রকৃত মানব উন্নয়ন অনিশ্চিত করছে; নগরায়নের নামে বস্তিয়ায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করছে; গ্রামীণ অর্থনীতিকে নিঃস্বায়িত করে গ্রামে এখন ভিক্ষুকায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করছে, আর ঢাকা শহরের রিক্সা-ভ্যান-ঠেলাগাড়ী উচ্ছেদের যে পরিকল্পনা তা গ্রামীণ ভিক্ষুকায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করবে (অথচ সংশ্লিষ্টরা ভুলে গেছে যে ঢাকা শহরের রিক্সা-ভ্যান-ঠেলাগাড়ী চালকেরা বছরে ১,২০৬ কোটি টাকা গ্রামে পাঠিয়ে থাকেন) (সারণি: দেখুন)। এক কথায় সমগ্র জাতীয় অর্থনীতিকে দুর্বৃত্তায়িত করার মাধ্যমে শেষাবধি সমগ্র উপরিকাঠামোকেই (রাষ্ট্রের মতাদর্শসহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান) জনকল্যাণবিমুখ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করেছে, যার অন্তর্ভুক্ত আইন-শৃংখলা, বিচার বিভাগ, নির্বাচন, সংসদ, স্থানীয় সরকার, আমলাতন্ত্র, রাষ্ট্রীয়-অরাষ্ট্রীয় ছোট-বড় ক্রয়-বিক্রয়।

সারণী : ঢাকা শহরে রিক্সা-ভ্যান-ঠেলাগাড়ীর অর্থনৈতিক পাটিগণিত: কর্মসংস্থান

	রিক্সা	ভ্যান ও ঠেলাগাড়ী	মোট
সংখ্যা	২৫০,০০০	৫০,০০০	৩০০,০০০
চালক	৫০০,০০০	১২০,০০০	৬২০,০০০
মালিক	৫০,০০০	২৫,০০০	৭৫,০০০
মিস্ত্রি			৫,৮০০
মোট	৫৫০,০০০	১৪৫,০০০	৭০০,৮০০

সারণী : ঢাকা শহরে রিক্সা-ভ্যান-ঠেলাগাড়ীর অর্থনৈতিক পাটিগণিত: পরিবার সদস্য সংখ্যা

পরিবার	রিক্সা	ভ্যান ও ঠেলাগাড়ী	মোট
চালক	২৫,০০,০০০	৬,০০,০০০	৩১,০০,০০০
মালিক	২৫০,০০০	১২৫,০০০	৩৭৫,০০০
মিস্ত্রি			২৯,০০০
মোট	২৭,৫০,০০০	৭২৫,০০০	৩৫,০৪,০০০

সারণী : ঢাকা শহরে রিক্সা-ভ্যান-ঠেলাগাড়ীর অর্থনৈতিক পাটিগণিত: বছরে আয় ও গ্রামে অর্থ প্রেরণ (কোটি টাকায়)

শ্রেণী বিন্যাস		রিক্সা	ভ্যান ও ঠেলাগাড়ী	মোট
চালক:	বছরে আয়,	১৮২৫	৪৩৮	২২৬৩
তন্মধ্যে,	নিজ খোরাক	৭৩০	১৭৫	৯০৫
	পরিবারে প্রদেয়	১০৯৫	২৬৩	১৩৫৮
	গ্রামে প্রেরণ	৯৩১	২২৩	১১৫৪
মালিক:	বছরে আয়	৬৪	৩২	৯৬
তন্মধ্যে,	পরিবারে প্রদেয়	৬৪	৩২	৯৬
	গ্রামে প্রেরণ	৩২	১৬	৪৮
মিস্ত্রি:	বছরে আয়,	২৭	৫	৩২
তন্মধ্যে,	নিজ খোরাক	১১	২	১৩
	পরিবারে প্রদেয়	১৬	৩	১৯
	গ্রামে প্রেরণ	৩.৩	০.৭	৪
চালক-মালিক-মিস্ত্রি:	বছরে আয়,	১৯১৬	৪৭৫	২৩৯১
তন্মধ্যে,	নিজ খোরাক	৭৪১	১৭৭	৯১৮
	পরিবারে প্রদেয়	১১৭৫	২৯৮	১৪৭৩
	গ্রামে প্রেরণ	৯৬৬	২৪০	১২০৬

অর্থনৈতিক বিকাশের এ প্রবণতার নিট ফল দাঁড়িয়েছে এমন যে, বর্তমান আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে হয় সুস্থ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনও প্রক্ষেপণ এ মুহূর্তে অসম্ভব অথবা আমরা সম্ভবত একটি বড় রকমের সামাজিক-রাজনৈতিক সংঘাতের সকল শর্ত পূরণ করেছি। ক্ষমতাহীন ১৩ কোটি ৯০ লাখ মানুষ ১০ লাখ ক্ষমতাধর মানুষকে অবিশ্বাস করেন; সম্ভবত করেন ঘৃণাও । ক্ষমতাহীন মানুষরা রাষ্ট্র, সরকার ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের প্রতি সম্ভবত আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। তাদের ক্ষোভ গুমরাচ্ছে কিন্তু প্রকাশ পাচ্ছে না। ক্ষমতাহীন মানুষরা একধরনের 'তাতে কিছু যায় আসে না' (indifferent) মানুষে রূপান্তরিত হয়েছেন বলে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়। সম্ভবত প্রচণ্ড ঝড়ের পূর্বাভাস;বিক্ষুব্ধ প্রশান্ত মহাসাগরের শান্ত অবস্থা।

অর্থনীতির রূপান্তর: নিকৃষ্ট পুঁজি ও অনুৎপাদনশীল খাতের বিকাশ

মুক্তবাজার অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের তোড়ে এদেশে ইতোমধ্যে সৃষ্ট অনুৎপাদনশীল খাত এবং নিকৃষ্ট পুঁজির বিকাশ-শর্ত পরিপুষ্ট হচ্ছে। এ কারণেই শিল্পায়নসহ উন্নয়ন সম্ভাবনা কাঠামোগতভাবে রুদ্ধ। লক্ষণীয় যে, স্বাধীনতার প্রাক্কালে এদেশ ছিল প্রকৃতই কৃষি প্রধান। মোট জাতীয় উৎপাদনের ৬০ ভাগ তথা দেশের ৮০ ভাগ মানুষ ছিল কৃষি নির্ভর। তিরিশ বছর পর এখন কৃষির অবদান জাতীয় উৎপাদনের ২৫ ভাগ আর কৃষির ওপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা ৫০ ভাগ। অর্থাৎ গত তিন দশকে গ্রামীণ মানুষের আয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ অকৃষি-কর্মকাণ্ড নির্ভর হয়েছে। অর্থনীতিবিদদের অনেকেই এটাকে উন্নয়নের মাপকাঠি বলে মনে করছেন। কিন্তু ভুললে চলবে না যে, গত তিন দশকে জাতীয় উৎপাদনে শিল্পের অবদান আদৌ বাড়েনি বললেই চলে (৮ থেকে ১০%)। আর শিল্প খাতের যেসব অংশে অপেক্ষাকৃত বেশি প্রবৃদ্ধি ঘটেছে, সেগুলো প্রকৃত শিল্পখাত কি না (প্রশ্নটি জোসেফ কেনেথ এ্যারো উত্থাপন করেছেন[৫]), তা তলিয়ে দেখতে হবে। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মৌলিক শিল্প (বা mother industry, যেমন জয়দেবপুরের মেশিন টুলস্ ফ্যাক্টরি অথবা চট্টগ্রামের ইস্পাত কারখানা ও জি এম প্লান্ট)সহ দেশজ কাঁচামাল নির্ভর শিল্প (পাটকল) বিলুপ্ত হচ্ছে, অথচ বিদেশি কাঁচামাল নির্ভর হালকা শিল্প (যেমন দর্জি শিল্প, বা তৈরি পোষাক শিল্প অথবা জানালা দরজার গ্রীল বানানোর কারখানা অথবা প্রযুক্তি হস্তান্তরের নামে গছানো পরিবেশ বিপর্যয়কারী শিল্প), যেখানে মূল্য সংযোজন ও সামাজিক উপযোগ অত্যন্ত কম, বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং সামগ্রিক কাঠামোটিই এমন যেখানে এমন কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে না যা সুদৃঢ় অর্থনৈতিক উন্নয়ন-ভিত্তির নির্দেশক। শিল্প বিকাশের বিপরীতে যা দ্রুত গতিতে বেড়েছে ও বাড়ছে তা হ'ল সেবা খাত। জমি-সম্পত্তি ক্রয়, নির্মাণ কাজ, রিয়াল এস্টেটসহ বিভিন্ন ধরণের ব্যবসা মিলে একক বৃহত্তম এই খাত মোট জাতীয় উৎপাদনে ৫০ ভাগ অবদান রাখছে। এতে দাঁড়ালোটা কি? কৃষি ও শিল্প– উৎপাদনশীল খাতদুটোর জায়গা দখল করলো অপেক্ষাকৃত অনুৎপাদনশীল সেবা খাত। সম্পদবানরা কেন যেন উৎপাদনশীল কৃষি-শিল্পে বিনিয়োগের পরিবর্তে জমিজমা কেনা আর বাড়ীঘর নির্মাণ[৬] ও ব্যবসাপাতিতে মনোনিবেশ করলেন। অর্থাৎ বিকশিত হ'ল এক ধরণের নিকৃষ্ট পুঁজি যেখানে বিনিয়োগ বাড়বে কিন্তু উৎপাদনশীল বিনিয়োগ স্থবির হয়ে যাবে এবং এর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক থাকবে বিদেশি সাহায্য-নির্ভরতা, কালো টাকার দাপট এবং এসবের সহায়ক রাজনৈতিক কাঠামোর।

কৃষি : ভিক্ষুকায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত ও ক্ষমতাবানদের আঁতাত শক্তিশালী করেছে

কৃষিকে শিল্পায়নের ভিত্তি বলা হয়। অথচ শিল্পায়নের ভিত্তি হিসেবে কৃষিকে কখনও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। স্বাধীনতার পরে কৃষি উৎপাদন নিয়ে বাগাড়ম্বর হয়েছে অনেক। কৃষিতে মোট উৎপাদন (ধানের) বৃদ্ধি পেয়েছে দ্বিগুণ; তবে মাথাপিছু উৎপাদন স্থবির। ১৯৭৩-৭৪ সালে মাথাপিছু চালের উৎপাদন ছিল ১৪০ কেজি, ৩০

[৫] বিস্তারিত দেখুন, Kenneth J. Arrow, *Some Paradoxes of Sustainability*: Empirical and Theoretical. বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত লোক বক্তৃতা, ঢাকা, ১৮ ডিসেম্বর, ২০০২।

[৬] এসব জমিজমা আর ফ্লাটের দরদাম কোনও ধরনের মূল্যতত্ত্ব, বেতন কাঠামো ও জীবনযাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ বৈপরীত্য বিশ্লেষণে প্রথাসিদ্ধ অর্থনীতি শাস্ত্র অপারগ।

বছর পরে এখন তা ১৩৮ কেজি। আমন ও আউশের জমি কমেছে, বেড়েছে বোরো চাষ। উৎপাদনশীলতা যে হারে বেড়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি হারে বেড়েছে সারের ব্যবহার (৮ গুণ) ও সারের দাম (১৪ গুণ)। উৎপাদন ব্যয় যা বেড়েছে তাতে হিসেব কষে বোঝা দুষ্কর যে, কৃষক এখনও কেন কৃষি কাজ করছেন। কৃষি পণ্যের বাজার মূল্য প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় মেটায় কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। [৭]সম্ভবত অন্য কোন বিকল্প থাকলে এদেশের কৃষক কৃষি কাজ ছেড়ে দিতেন। এখানে ভর্তুকি উচ্ছেদের বিতর্কে না জড়িয়েও বলা যেতে পারে যে, ভর্তুকি উচ্ছেদের করতে পরামর্শ দাতারই তাদের নিজেদের দেশে উদার হাতে কৃষি ভর্তুকি দেন: যুক্তরাষ্ট্রে বছরে কৃষি ভর্তুকির পরিমাণ ২০ বিলিয়ন ডলার আর ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে মোট কৃষি ভর্তুকির পরিমাণ সমগ্র সাব-সাহারান আফ্রিকার সকল দেশের সম্মিলিত জাতীয় আয়েরও বেশি। ভর্তুকি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয় ইউনিয়ন "দ্বিমুখী নীতি" (double standard) অনুসরণ করেন। যুক্তরাষ্ট্র তাদের কৃষিতে আগামী দশবছরে প্রায় ৩০০ বিলিয়ন ইউএস ডলার ভর্তুকি দেবে (জোসেফ স্টিগলিজ, ঢাকা: ১৪ আগস্ট ২০০৩)। কৃষি পণ্যের বিশ্ববাজার দখলের জন্য প্রয়োজনে উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে কম দামে পণ্য বিক্রি করবে; যেটা অনেক ক্ষেত্রেই তারা করে। ভেঙ্গে যাবে আমাদের কৃষি ব্যবস্থা।

যে 'সবুজ বিপ্লব' কৃষিতে অধিক ফলন নিশ্চিত করেছে, সে বিপ্লবই কিন্তু অবলুপ্তি ঘটিয়েছে অনেক প্রজাতির ধানের, হ্রাস করেছে প্রাকৃতিক উর্বরতা, বিনষ্ট করেছে অভ্যন্তরীণ মৎস্য সম্পদ (পৃথিবীর চতুর্থ শীর্ষ স্থান থেকে এখন ৮৫তম স্থানে), আমদানী করেছে নতুন নতুন পোকামাকড়, প্রাণবৈচিত্র ও জীববৈচিত্র বিনষ্ট করেছে। আর কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রযুক্তিগত বিষয়ে অনেক কিছু বলা হলেও কৃষিসংস্কারের (agrarian reform অর্থে) বিষয়টিকে সব সময় অবহেলা অথবা ভয় করা হয়েছে। অথচ এ দেশে, অন্য কিছু বাদ দিলেও, ৩৩ লাখ একর যে খাস কৃষিজমি ও জলাশয় আছে, যা দরিদ্র মানুষেরই ন্যায্য প্রাপ্য, সে বিষয়ে কোনো সরকারই কখনও আন্তরিক ছিলেন না। এক দিকে কৃষিজমির মালিকানার পুঞ্জিকরণ আর অন্যদিকে খাস জমির জবর দখল– এ নিয়ে ক্ষমতাবানরা গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে শক্ত অবস্থান নিয়েছেন। গত তিন দশকে গ্রামীণ ও শহুরে ক্ষমতাবানদের মধ্যে শক্তিশালী আঁতাঁতও সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন সূত্রে। এ আঁতাতের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে স্থানীয় সরকারের আসন্ন নির্বাচনে। নিকৃষ্ট পুঁজির বিকাশে এটাও আরেকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বাংলাদেশী সংস্করণ।

ধানের উৎপাদন দ্বিগুণ হলেও গ্রামাঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা মজবুত হয়নি। গুটি কয়েক মানুষের হাতে কৃষি সম্পদের পুঞ্জিভবন, গ্রামীণ অর্থনীতিতে লুটেরা-টাউট শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণক্ষমতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতার কারণে কৃষি-নির্ভর ব্যাপক জনগোষ্ঠির ভিক্ষুকায়ন ও নিঃস্বায়ন (pauperization) প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছে। নিঃস্বায়িত কৃষক বাধ্য হয়ে অভিবাসিত হয়েছেন– এসেছেন শহরে, প্রথমে একা, আস্তে আস্তে এনেছেন পরিবার-পরিজন। এদিকে শহরে গড়ে ওঠেনি কলকারখানা। অতএব গ্রাম থেকে শহরে আসা নিঃস্ব কৃষককে কাজের সন্ধানে ইনফর্মাল সেক্টরে নিম্নমজুরীর কাজে যোগ দিতে হয়েছে আর বাসের জন্য বেছে নিতে হয়েছে বস্তি। সুতরাং তথাকথিত নগরায়ন আসলে কিছুই নয়, এটা আক্ষরিক অর্থেই বস্তিয়ায়ন (slumization, not urbanization[৮])। উল্লেখ্য যে, গ্রামীণ ভিক্ষুকায়ন ও নিঃস্বায়ন প্রক্রিয়ার গতিপ্রকৃতি এমনটি থাকলে ২০২০ সালে বাংলাদেশে শহুরে জনসংখ্যা হবে প্রায় ৯ কোটি, যা আমাদের ১৯৮১ সালের

---

[৭] 'প্রকৃত উৎপাদন ব্যয়, বাজার মূল্য ও ভর্তুকি'– এক জটিল সমীকরণ। তবে 'আমদানি নির্ভরতা, সংশ্লিষ্ট শুল্ক, ভর্তুকি ও চোরাচালান' সমীকরণে শুধু কৃষিজ- পণ্যই নয় কৃষি-ভিত্তিক ও গ্রামীণ শিল্প এখন ধ্বংসের মুখে। এ ধ্বংসের সাম্প্রতিক উদাহরণ হ'ল ২৫ লাখ কর্মসংস্থান সমৃদ্ধ গ্রামীণ পোলট্রি ফার্ম। সরকারি হিসেবেই প্রায় ১১ হাজার ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তার পোলট্রি ফার্ম গত কয়েক মাসে বন্ধ হয়েছে। আমদানি নির্ভর পোলট্রি ফিডের উচ্চমূল্য এবং এর বিপরীতে ডিম ও মাংসের কম মূল্য (চোরাচালানকৃত ডিম ও মাংসের তুলনায়)-এ ধ্বংসের কারণ। প্রতিবেশী ভারতে পোলট্রি ফিডে ভর্তুকি দেয়ার ফলে ডিমের হালি ৬-৮ টাকা, আর এখানে খামারিরা হালি প্রতি পান সর্বোচ্চ ১০ টাকা। সেই সঙ্গে ব্যাংক ঋণের জাল আমাদের ক্ষুদ্র ও মাঝারি পোলট্রি উদ্যোক্তাদের নিঃস্বায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করছে।

[৮] এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, Barkat Abul and S Akhter, A Mushrooming Population: The Threat of Slumization Instead of Urbanization in Bangladesh, in *The Harvard Asia Pacific Review*, Vol 5, Issue 1, 2001: 27-30।

মোট জনসংখ্যার সমান। আর এই ঢাকা শহরেই ২০১০ সালে জনসংখ্যা হবে প্রায় দুই কোটি (বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী), যার মধ্যে এক কোটি বাস করবে বস্তিতে। দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদে পড়া অর্থনীতিতে নিকৃষ্ট পুঁজি বিকাশের এটাও একটি প্রতিফল। এখানে অনেক কিছুই ঘটবে কিন্তু দেশজ অর্থনীতির ভিত্তি মজবুতকরণের মতো উন্নয়ন ঘটবে না।

শিল্প– দুর্বৃত্তায়নের কারখানা; শিল্পায়ন– অসম্ভব অনুসিদ্ধান্ত না কি সীমিত সম্ভাবনার বিষয়

পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের আওতায় একমেরুকৃত একচেটিয়া পুঁজির নিয়ামক ভূমিকা আর সেই সঙ্গে বাংলাদেশের দুর্বৃত্তায়িত অর্থনীতির প্রভাবের মধ্যে কৃষি-শিল্প-সমৃদ্ধ উৎপাদনশীল অর্থনীতির ভিত্তি বিনির্মাণ দুঃসাধ্য। অর্থনীতির দুর্বৃত্তায়ন সমাজ, রাজনীতি আর রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকেও দুর্বৃত্তায়িত করেছে। পুরো কাঠামোর এ দুর্বৃত্তায়ন প্রক্রিয়া রোধ করা ছাড়া জনকল্যাণ ও শিল্পায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। সমগ্র বিষয়টির বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান আদমজী পাটকলের বিলুপ্তির বিভিন্ন দিক লক্ষ্য করা যেতে পারে। কারণ আদমজীর বিলুপ্তি আমাদের অর্থনীতির সাধারণ কোনো ঘটনা নয়। এ নিয়ে যা কিছু বলা হয়েছে আর যা বলা হয়নি, তা সবই আমাদের দেশে দুর্বৃত্তায়নের কাঠামোতে শিল্প বিকাশসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিষয়ের ইঙ্গিত দেয়।[৯] বিষয়গুলো হচ্ছে :

এক. তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ জনগণের কল্যাণসংশ্লিষ্ট জরুরি বিষয়ে পুর্ণাঙ্গ সব তথ্য পাওয়া প্রায় অসম্ভব (উন্নয়নের পূর্বশর্ত যে 'স্বচ্ছতার গ্যারান্টি,' এ ক্ষেত্রে তা ভঙ্গ করা হচ্ছে)।

দুই. বিশ্বায়নের যুগে একচেটিয়া পুঁজির নিঃশর্ত বিকাশে তৃতীয় বিশ্বের শিল্পায়ন-সম্ভাবনা রুদ্ধ করতে হবে (অর্থাৎ সমগ্র বাজার-ব্যবস্থা রাখতে হবে কেন্দ্রের অধীন; এ ক্ষেত্রে ১নং শর্তের উপস্থিতি জরুরি)।

তিন. তৃতীয় বিশ্বের শিল্পায়ন প্রক্রিয়া রুদ্ধ করতে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফসহ বিভিন্ন সংস্থা খুবই তৎপর (অর্থাৎ ২ নং শর্ত বাস্তবায়নে কার্যকর মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান থাকতেই হবে)।

চার. তৃতীয় বিশ্বের প্রান্তস্থ সমাজ-অর্থনীতিকে কেন্দ্রস্থ একচেটিয়া পুঁজির অধীন রাখার স্বার্থে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদ শক্তিশালী করাটাই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা (অর্থাৎ ২ নং শর্ত কার্যকরী করতে তৃতীয় বিশ্বে নিকৃষ্ট পুঁজির বিকাশ নিশ্চিত করতে হবে)।

পাঁচ. তৃতীয় বিশ্বে স্ব-চালিত কল্যাণমুখী আর্থ-সামাজিক কাঠামোর ভিত্তি বিনির্মাণ দুঃসাধ্য (১,২,৩ ও ৪ নং শর্ত কার্যকর হলে)।

ছয়. প্রান্তস্থ তৃতীয় বিশ্বের সকল দেশে উন্নয়নের একই পদ্ধতি কার্যকর নয়; সুদূর প্রান্তস্থ অর্থনীতিতে শিল্প-বিকাশ রুদ্ধ করতে প্রান্তের কোনো কোনো অর্থনীতিকে এজেন্সি-পুঁজির বিকাশে ছাড় দিতে হবে (যেমন ভারতের পুঁজির বিকাশের স্বার্থে এখানে যখন পাটকল বন্ধ হবে তখন ভারতে চালু হবে নতুন পাটকল। আমাদের পাটকল বন্ধ করা ও ভারতে পাটকল প্রতিষ্ঠা করা, উভয় ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে মধ্যস্থতাকারী বিশ্বব্যাংক)।

এদেশের কোনো পুঁজিপতি নন, পাকিস্তানী এক পুঁজিপতি ১৯৫১ সালে তার পারিবারিক নামে আদমজী পাটকল স্থাপন করে। এদেশে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধিতে পাটকলটি ভূমিকা রেখেছিল। অন্যদিকে বৈদেশিক মুদ্রা উপাজর্নের অন্যতম প্রধান মাধ্যম ছিল পাটকলটি। পাটের রপ্তানি আয়ের উপর ৩৫% বোনাস ভাউচার (ভর্তুকি) পেয়ে পাটশিল্প লাভজনক শিল্পে রূপান্তরিত হয়। আদমজীর অনুপ্রেরণায় অন্যান্য পাট ও সুতাবস্ত্রকল

[৯] বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত, 'আদমজী পাটকলের বিলুপ্তি এবং বাংলাদেশের শিল্পায়নের ভবিষ্যৎ, সমাজ-রূপান্তর অধ্যয়ন কেন্দ্র আয়োজিত জাতীয় সংলাপে পঠিত প্রবন্ধ, ঢাকা: ৩১ ডিসেম্বর ২০০২।

স্থাপনের মাধ্যমে এদেশে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। সৃষ্টি হয়েছিল ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ আর জাতীয় পুঁজির বিকাশের ধারা । ১৯৭১-এর আগে এসব শিল্প কারখানা যথেষ্ট লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। স্বাধীনতার পরে পশ্চিম-পাকিস্তানী মালিকদের ফেলে যাওয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কলকারখানা বাংলাদেশ সরকার অধিগ্রহণ করে রাষ্ট্রায়ত্ত খাত সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রায়ত্ত খাত প্রকৃতপক্ষে কোটি কোটি টাকার সম্পদ লুণ্ঠনের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র হিসেবে দেখা দেয়। সরকারি আমলা, মন্ত্রী-এমপি, নেতা-কর্মী, মিলের দূর্নীতিবাজ ব্যবস্থাপক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, সিবিএ নেতা, ব্যবসায়ী– এদের সকলেরই কালো কারবারের চারণক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয় রাষ্ট্রায়ত্ত খাত। মিল পরিচালন, পরিকল্পনা, ক্রয়-বিক্রয়– কোনো কিছুতেই শ্রমিকদের কোনো ধরনের অংশগ্রহণ কখনও ছিল না। এ ধরনের রাষ্ট্রায়ত্ত খাত আর যাই হোক সমাজতন্ত্রের সমার্থক নয়। নব্বইয়ের দশকে মিলের উৎপাদন সংকোচন নীতি গ্রহণ করা হয়। কিন্ত আমলাতান্ত্রিক ব্যয়সহ বিভিন্ন ধরনের অনুৎপাদনশীল ব্যয় বৃদ্ধি রাখা হয় অব্যাহত। বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্টে এসব উল্লেখ করা হয় না। বলা হয়, আদমজীর এক হাজার ২০০ কোটি টাকা লোকসান বা দেনার কথা। তারা তাদের জুট সেকটর রিস্ট্রাকচার প্রোগ্রাম (জুট সেকটর এ্যাডজাস্টমেন্ট ক্রেডিট)-এর আওতায় আদমজীসহ অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত মিল-কলকারখানা বন্ধ এবং/অথবা ব্যক্তিখাতে হস্তান্তর করাটা আমাদের দেশের জন্য উন্নয়ন সহায়ক বলে মন্তব্য করে[১০]। অর্থাৎ চূড়ান্ত বিচারে যা সৃষ্টির সামর্থ্য নেই, তা ধ্বংস করাটাই তাদের অভিষ্ট।

বলা হয়েছে, তিন হাজার ৩০০ তাঁত সজ্জিত আদমজী পাটকল গত তিন দশকে এক হাজার ২০০ কোটি টাকা লোকসান দিয়েছে। এ লোকসান দূর করতে পারলে বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশনের লোকসান এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস পাবে (বিশ্ব ব্যাংকের বক্তব্য)[১০]। লোকসানের এ হিসেব কিভাবে করা হ'ল, তা কখনও প্রকাশ করা হয়নি। সামাজিক কস্ট-বেনিফিট প্রসঙ্গ বাদই দিলাম। এমনকি আর্থিক কস্ট-বেনিফিট-এর হিসেবও বিচার-বিশ্লেষণের জন্য জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে কখনও পেশ করা হয়নি। এসব হিসেবপত্তরের পদ্ধতি সম্পর্কেও আমরা জানতে পারলাম না। প্রকৃতপক্ষে আদমজী পাটকল আদৌ লোকসানি প্রতিষ্ঠান কিনা– এ বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ লাভ-ক্ষতির সাধারণ পাটিগণিতিক হিসেব তা নির্দেশ করে না। আর আদমজীতে প্রত্যক্ষ এবং আদমজীকেন্দ্রিক পরোক্ষ কর্মসংস্থান, কৃষি-অর্থনীতিতে পাটের গুরুত্ব এবং বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক তন্তুর প্রকৃত চাহিদা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিবেচনায় 'লোকসান' নেহায়েত অজুহাত মাত্র। আসলে পূর্বে উল্লিখিত গভীর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ কার্যকরী করতেই আদমজীকে লোকসানি প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখানো জরুরি হয়েছিল।

আদমজী পাটকল বিলুপ্ত হয়েছে ৩০ জুন (২০০২)। পূর্ববর্তী তিন দশকে এক হাজার ২০০ কোটি টাকার লোকসানের ওজুহাত দেখানো হয়েছে। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ বিচার-বিশ্লেষণে সহায়ক হতে পারে, এমন অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। গোপন করা হয়েছে। তথ্য জানার অধিকার সংক্রান্ত আমাদের মানবাধিকার লজ্জিত হয়েছে। বলা হয়নি অনেক কিছু যা বললে আদমজী বন্ধ করার পক্ষে যুক্তি দাঁড় করানো সম্ভব হ'ত না। সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ যেসব কথা বলা হয়নি, তার মধ্যে অন্যতম হ'ল :

এক. তিন দশকে বছরে আদমজী দুই হাজার ২৩৮ কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রাসহ আয় করেছে তিন হাজার ৭০৪ কোটি টাকা (অথচ বলা হয়েছে এক হাজার ২০০ কোটি টাকা লোকসানের কথা);

দুই. বিভিন্ন কর বাবদ আদমজী সরকারকে পরিশোধ করেছে ৯০০ কোটি টাকা; ব্যাংকের সুদ বাবদ পরিশোধ করেছে প্রায় ৩৭০ কোটি টাকা আর বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করেছে ২০০ কোটি টাকা।

[১০] এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, Bangladesh Review of Public Enterprise Performance and Strategy: Key Issues and Policy Implications, World Bank: November 2002, Dhaka, PP. 55-59 ।

তিন. আদমজীর প্রায় ৪০ হাজার শ্রমিক বেকার আর মিলের আশে-পাশে কর্মরত ৩০ হাজার মানুষ কর্মহীন হলে তাদের পরিবার পরিজনসহ পাঁচ লাখ নির্ভরশীল মানুষের কি হবে?

চার. চিন্তা করা হয়নি, এলাকার পাঁচটি স্কুলের ছয় হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষার কি ব্যবস্থা হবে?

পাঁচ. সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা একটুকুও ভাবেননি যে, আদমজীর পাট-চাহিদা-নির্ভর এক কোটি কৃষক পরিবারের কি হবে?

ছয়. বিশ্ব ব্যাংকের ২৫ কোটি ডলার 'জুট সেকটর এ্যাডজাস্টমেন্ট ক্রেডিটের' আওতায় বাংলাদেশে যখন পাট শিল্প বিলুপ্ত হচ্ছে ঠিক তখনই একই বিশ্ব ব্যাংক ২৫ কোটি ডলার সাহায্য দিচ্ছে ভারতের পাট শিল্প বিকাশে। ১৯৯৪ সালে বিশ্ব ব্যাংক অন্যান্য সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ পাটকল ধীরে ধীরে বন্ধ করার কথা বলেছে। বিশ্বব্যাংকের প্রেসক্রিপশন হ'ল, পাটকল ডাউন সাইজ করে উৎপাদন ক্ষমতা কমাও, রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল বেসরকারি খাতে ছেড়ে দাও, কিছু কল বন্ধ কর (যুক্তি যা-ই হোক না কেন)। উল্লেখ্য যে, ঠিক আদমজী বন্ধ করার সময়ই ভারতের পশ্চিম বাংলায় নতুন ৪টি পাটশিল্প স্থাপন করে ১০ হাজার শ্রমিকের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হয়েছে। কেন? অর্থনীতি শাস্ত্রের কোন তুলনামূলক সুবিধার (comparative advantage) কারণে এমনটি হচ্ছে? নাকি রাজনীতি ও জাতীয় পুঁজির বিকাশ এসব সিদ্ধান্তে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে?

সাত. আদমজী জুট মিলের ৩০০ একর জমি ও কয়েক হাজার কোটি টাকার অস্থাবর সম্পদের কি হবে? এসব কি পূর্বপরিকল্পিত? আমরা এসবের কিছুই জানি না কেন? কে-কিভাবে-কতটুকু লুটপাট করবে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

আট. সরকার ও দাতাগোষ্ঠি উভয়েই বলেছে, আদমজীতে বড় ধরনের দুর্নীতি হয়েছে। কে-কখন-কিভাবে দুর্নীতি করেছে– গোপন রাখা হয়েছে সেসব কথা। কাঁচাপাট ক্রয়, পাটজাত দ্রব্য বিক্রয় এবং যন্ত্রপাতি ক্রয় ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কি পরিমাণ দুর্নীতি হয়েছে, এ বিষয়ে কখনও কোনো তদন্ত করা হয়নি। তবে একথা সত্য যে, গত তিন দশকে যারা এসবের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তারা আনুমানিক ১২ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ দুর্নীতি করেছেন। অথচ সরকারিভাবে লোকসানের পরিমাণ বলা হয়েছে এক হাজার ২০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ আসলে আদমজীর কমপক্ষে ১০ হাজার ৮০০ কোটি টাকা লাভ হয়েছে। এসব কথা সত্য হলে আদমজী পাটকল লোকসানি হয় কিভাবে?

নয়. মাত্র ১৭০ কোটি টাকা খরচে আদমজী পাটকল আধুনিকিকরণ ও বহুমাত্রিকিকরণ (BMRI) সম্ভব ছিল; কিন্তু তা না করে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হ'ল কেন? বিশ্বব্যাপী যখন প্লাস্টিক ও পলিথিনের বিকল্প হিসেবে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে– তখন এ ধরণের সিদ্ধান্ত কেন? কার স্বার্থে?

দশ. সত্তরের দশকেও বাংলাদেশে ৮০ লাখ বেল পাট উৎপাদিত হতো আর ভারতে উৎপাদিত হতো ৫০ লাখ বেল। এখন ভারতে উৎপাদিত হচ্ছে বছরে গড়ে ৮০ লাখ বেল আর বাংলাদেশে তার অর্ধেক– ৪০ লাখ বেল। অর্থাৎ আমাদের দেশের অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল পাটের উৎপাদন কমছে অথচ ভারতে তা বাড়ছে আর সেখানকার পাট শিল্প বিকশিত হচ্ছে। এসবের অন্তর্নিহিত কারণ কি? কেন এদেশের শিল্প-কৃষি ধ্বংস করার এ মহোৎসব?

এগার. বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি খাতে ছোট-মাঝারি-বড় যে ৭০টি পাটকল আছে, পাটের অভাবে অনেক সময় সেগুলোর উৎপাদন ব্যহত হয়। পাট সংকটের এ কারণ দুর্বোধ্য। কারণ এদেশে এখন বছরে ৪০ লাখ বেল পাট উৎপাদন হয়, আর পাটকলের চাহিদা প্রায় ৩০ লাখ বেল। উদ্বৃত্ত পাটের পরিমাণ ১০ লাখ বেল, অথচ রপ্তানি হয় প্রায় ১৭ লাখ বেল। রপ্তানিযোগ্যতা ১৭ লাখ বেল হলে প্রায় ৫০ লাখ বেল উৎপাদন হওয়া উচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে না। কেন? এ প্রশ্নের সরকারি উত্তরটা কি? তা ছাড়া সরকারিভাবে নির্ধারিত মূল্য পাটের মান ভেদে মণ প্রতি ৩৩০ টাকা থেকে ৬৮০ টাকা। অথচ কৃষককে দেওয়া হয় ১৫০ টাকা থেকে ২০০ টাকার মধ্যে (অন্তত এ বছর

তা-ই হয়েছে)। এ হিসেবে বাংলাদেশের পাটচাষী এ বছর ১০০ কোটি টাকার ঊর্ধ্বে লোকসান দেবেন। আর পাটের প্রকৃত উৎপাদনমূল্য বিচার করলে লোকসান ২০০ কোটি টাকার ঊর্ধ্বে হতে পারে। কৃষকের জন্য পাটের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত না করার কারণ হচ্ছে চোরাচালান উৎসাহিত করা, যে চোরাচালান বাংলাদেশের উৎপাদিত পাট ভারতের পাটকলগুলোর কাঁচামালের উৎস-বাহক হিসেবে কাজ করে। অতএব সমগ্র মূল্য নির্ধারণ ও মূল্যব্যবস্থাপনার বিষয়টি একদিকে যেমন দেশজ পাট শিল্প ধ্বংসের কারণ, তেমনি অন্যদিকে চোরাচালান-সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠিসমূহকে উৎসাহিত করে এ দেশে কালো অর্থনীতির প্রসার ও ভারতের পাট শিল্পকে পরিপুষ্ট করার মাধ্যম।[১১]

বার. স্পষ্ট করে বলা না হলেও সরকার এবং কোনও কোনও মহল মনে করে যে, পাটজাত পণ্য উৎপাদন নয়, ভারতে কাঁচামাল হিসেবে পাট রপ্তানি করাই শ্রেয়। অন্তত বিজিএমএ সূত্র বলছে যে, অতীতের তুলনায় ভবিষ্যতে ভারতে আমাদের কাঁচামাল রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে (১৯৯৯-২০০০ সালে পাট রপ্তানি হয়েছে প্রায় ১৪৮ কোটি টাকার সমপরিমাণ)। ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে প্রান্তস্থ অর্থনীতিকে কেন্দ্রের কাঁচামাল সরবরাহকারী ও কেন্দ্র উৎপাদিত ফিনিশড্ গুডস্-এর ব্যবহারকারী হিসেবে দেখা হতো। আমরা কি পাট কেন্দ্রিক ঔপনিবেশিক আমলের অর্থনীতিতে ফিরে যাচ্ছি? আমরা কি এমন এক অবস্থার দিকে ধাবিত যখন ভারত, থাইল্যান্ড আর চীন থেকে পাটের বস্তা ও পাটজাত দ্রব্য কেনা ছাড়া আর উপায় থাকবে না?

তের. অর্থনীতির কোনো সূত্রই বলে না, মূল্য সংযোজনের (value addition) তুলনায় কাঁচামাল রপ্তানি শ্রেয়। পাটের ক্ষেত্রে এটা আরও সত্য। কারণ পাট প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে আমাদের ৫০ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। এদিকে পলিথিনসহ বিভিন্ন কৃত্রিম তন্তুর উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ায় পৃথিবীব্যাপী প্রাকৃতিক তন্তুর চাহিদা ক্রমবর্ধমান।

চৌদ্দ. আদমজী পাটকল চালু থাকার সময়, এমনকি গত বছরও, পাটের বাজার দর মণপ্রতি ৩৫০ টাকা থেকে ৫৫০ টাকার মধ্যে ছিল। অথচ এখন তা ১২০ টাকা থেকে ১৭০ টাকার মধ্যে (এলাকা, মান ও সময়ভেদে) উঠানামা করছে। জমির মূল্য হিসেবে ধরলে পাটের মণপ্রতি উৎপাদন ব্যয় হয় ৬০০ টাকা থেকে এক হাজার টাকা পর্যন্ত, আর জমির দাম বাদ দিলে ৩০০ টাকা থেকে ৪০০ টাকার মধ্যে। সুতরাং পাট বিক্রি করে কৃষক এখন আর উৎপাদন খরচও পোষাতে পারছেন না। পাটকল বন্ধ হলে পাটচাষীর অবস্থার আরও অবনতি হবে, ঐতিহ্যবাহী পাট শিল্প ধ্বংস হবে এবং 'সোনালি আঁশ গলার ফাঁস, কৃষকের এখন হাঁসফাঁস' অবস্থা হবে। সরকার একথা না বলে বলছে, 'পাট হবে নতুন সহস্রাব্দের তন্তু'। এসব বৈপরীত্য কেন?

অকথিত তথ্য আর পাট কেন্দ্রিক বিভিন্ন বৈপরীত্যের তালিকা আর না বাড়িয়ে উক্ত ও অনুক্ত কথা মিলিয়ে দেখলে দুর্বোধ্য থাকে না যে, পাটসহ সব ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের উন্নয়ন বিরোধী একটি রাজনৈতিক-অর্থনীতি যথেষ্ট সক্রিয়, যেখানে বিশ্বপুঁজিবাদের স্বার্থ রক্ষার্থে দাতা-গোষ্ঠির সন্তুষ্টি ও পাট-প্রতিযোগী অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী দেশসমূহের দীর্ঘ মেয়াদি স্বার্থ সংরক্ষণই মূল লক্ষ্য।

এদেশে রাষ্ট্র পরিতোষিত শিল্পের ইতিহাস পুরনো নয়। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহৎ পুঁজির নিয়ন্ত্রণে পূর্ব পাকিস্তানে যে শিল্প খাত গড়ে ওঠে তা তাদের জন্য লাভজনক ছিল। স্বাধীনতার পরে জাতীয়করণ করার ফলে ৭টি সংস্থার অধীনে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতই (অনেকেই এটাকে সমাজতন্ত্রের সমার্থক বলে মনে করেন) হয়ে দাঁড়ালো শিল্পের মূল ধারা। রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের মূল ধারা বিভিন্ন কারণে বিকাশ লাভ করেনি। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারি খাতে মূলধন গঠন প্রক্রিয়ার সকল বাধা ধীরে ধীরে

[১১] কৃষিজ পণ্যের মূল্য বিষয়টি পাট ছাড়াও আখ, ধান, শাক-শবজি সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কৃষিজ পণ্যের অভ্যান্তরীণ বাজার মূল্যমান ও ভর্তুকি, এবং আমদানি শুল্ক এসবে যথেষ্ট বৈপরীত্য আছে যা কৃষি উন্নয়ন বিরোধী।

অপসারিত হয়। গত চারটি শিল্প নীতিতে সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয় যে, রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের প্রাধান্য নিম্ন পর্যায়ে আনতে হবে, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের সকল বাধা দূরীভূত করতে হবে এবং সরকারিভাবে সকল ধরণের সুযোগ-সুবিধে নিশ্চিত করা হবে। আর সেই সঙ্গে বিশ্ব ব্যাংকের কাঠামোগত এ্যাডজাস্টমেন্ট নীতিমালাসহ রাষ্ট্রায়ত্ত খাত সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের ফর্দ এসব নিঃশর্তকরণে জোর সুপারিশ করেছে। এসব সুপারিশের মর্মবস্তু হ'ল জাতীয় পুঁজির বিকাশ রুদ্ধ করতে প্রথমে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বন্ধ অথবা বিরাষ্ট্রীয়করণ করতে হবে, তারপর বিরাষ্ট্রীয়কৃত শিল্প বন্ধ হবে; আর এর মাঝে জাতীয় সম্পদ লুটপাট হয়ে যাবে। অথচ বিশ্ব ব্যাংকের বাংলাদেশ প্রধান এখনও বলছেন রাষ্ট্রায়ত্ব খাত নানা ধরণের অর্থনৈতিক বিকৃতি (economic distortions) সৃষ্টি করে যা বেসরকারি খাত নির্ভর প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করে।[১২]

এদেশে শিল্পায়নের সম্ভাবনা যে সীমাবদ্ধ, তা তর্কাতীত। গত তিন দশকের শিল্প বিকাশের ধারা বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায় :

এক. রাষ্ট্রায়ত্ত খাত মানেই লুটপাট, ক্ষমতার অপব্যবহার, ভর্তুকি নির্ভরতা, নিম্নউৎপাদনশীলতা, অব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। বিভিন্ন সময় সরকার আর (বিশেষ করে ক্ষমতা গ্রহণের আগে এবং পরপর) দাতাগোষ্ঠি এসব বললেও এসবের সঙ্গে সম্পৃক্ত আমলা-ব্যবস্থাপক উচ্ছিষ্টভোগী ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের চিহ্নিত করা ও শাস্তির প্রয়োজনীয়তা কেউই বোধ করেননি।

দুই. বেসরকারি খাতের বিকাশ মানে যতটা না নতুন বেসরকারি শিল্পের প্রতিষ্ঠান, তার চেয়ে বেশি রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের বিরাষ্ট্রীয়করণ, যেখানে বেসরকারি মালিকদের (আমলা-রাজনীতিবিদের যোগসাজশে) মূল লক্ষ্য হ'ল হাজার হাজার কোটি টাকার রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুট করা, শিল্পের বিকাশ নয়। এর সর্বশেষ সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ– বিশ্বের সর্ববৃহৎ পাটকল আদমজী বন্ধ করে কমপক্ষে এক কোটি শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থহানী ঘটানো হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিরাষ্ট্রীয়করণ সম্পর্কিত অধ্যাপক রেহমান সোবহানের সাম্প্রতিক গবেষণা ফলাফল স্পষ্টভাবেই দেখায় যে, এ দেশে সরকার প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের কোনো ধনাত্মক ভূমিকাই স্বীকার করে না। এ অস্বীকৃতি ভবিষ্যতের শিল্প বিকাশে মারাত্মক প্রভাব ফেলবে; সমষ্টিক অর্থনীতিতে বিরাষ্ট্রীয়করণের ধনাত্মক তেমন অভিঘাত নেই; রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের বিরাষ্ট্রীয়করণ সমষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা হ্রাস করেনি। রাষ্ট্রায়ত্ত খাত সবসময় সরকারি সম্পদ বিনষ্ট করে– এ কথা সত্য নয়; বিরাষ্ট্রীয়করণ পরবর্তী কর্পোরেশনসমূহে আর্থিক লোকসান বৃদ্ধি পেয়েছে; বিরাষ্ট্রীয়করণের ফলে শিল্পের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির পরিবর্তে কারখানা বন্ধ হয়েছে ও কর্মসংস্থান হ্রাস পেয়েছে; শিল্প বিকাশে রাষ্ট্র ও সরকারের ভূমিকা, অঙ্গীকার ও ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্পের বিকাশ কেন্দ্রিক যে বিপরীতধর্মী ও অস্বচ্ছ নীতি নির্দেশনা দেখা যাচ্ছে তা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অর্থনীতিতে মারাত্মক ঋণাত্মক প্রভাব ফেলবে। অধ্যাপক রেহমান সোবহানের বিশেষ গুরুত্ববহ মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা হল: "The available evidence on the experience with privatisation suggests that enterprise closure, disemployment, possible accumulation of liabilities with the banks and possible revenue loss may have to be taken into account as part of the price we pay to improve profitability and reduce claims on the public exchequer...... However, the positive macro-economic impact of privatisation appears to be far from evident. Reports on the profit and loss accounts of the Sector Corporations from which SOEs are being divested, indicate that in the four years, 1979/80-1982/83, prior to the great wave of privatisation under President Ershad, total profits for 6 sector corporations added up to Tk. 1.5 billion and net profits were earned by the SOEs in three out of these 4 years (World Bank, 1985). In 1982/83, the last year prior to the big privatisations, SOE *profits* amounted to Tk. 912 million. This does not suggest that SOEs in Bangladesh were always a net drain on the pubic purse. In 1995/96, at the end of the BNP regime and the privatisation of 131 enterprises with a selling value of 1.8 billion, corporation loses increased to Tk. 3.2 billion (IRBD 1996). This suggests that a central argument for SOE privatisation, the reduction of macro-economic imbalances, appears to be invalid, at least in the context of Bangladesh.

---

[১২] দেখুন ফ্রেডারিক ডি টেম্পল, 'বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের মূল্যায়ন ও কৌশল', দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ ডিসেম্বর ২০০২।

During this period of divestiture, the volume of bank defaults to the commercial banks has also increased. This suggest that reduction of the size of the state sector and expansion of the private sector have brought no relief to the banking system just as it has brought no relief to the exchequer. ….

With a few exceptions, privatised units have not significantly improrved performance but have contributed to enterprise closures and disemployment. Private sector default to the banks has increased exponentially whilst private banks have been characterised by more adverse loan portfolios that the NCBs and have been maledicted to large scale insider trading……

The declared philosophy of the newly constituted *Privatisation Board* is to get SOEs from the public domain as fast as possible. This approach indicates some indifference as to whether such units, once privatised, are closed down these units will have to account for their accumulated liabilities to the banking system.

Such an approach to privatisation implies a certain innocence of vision in charting Bangladesh's future development landscape and the industrial strategy to be located within this design. In the prevailing policy vacuum, the current approach to privatisation thus appears to have introduced an entirely new logic to the divestiture process……..

A further hazard to Bangladesh's development prospects arises from the implications of a policy which envisages no future role for *public enterprise* in the manufacturing sector" (Rehman Sobhan, Privatisation in Bangladesh: An Agenda in Search of a Policy, CPD Occasional Paper Series, August 2002: 16-19).

তিন. শিল্প খাতে সরকারি ভূমিকা ও সামগ্রিক পরিবেশ কখনও শিল্প সহায়ক ছিল না। আশির দশকে যখন বলা হলো যে, বাণিজ্য ও সেবা খাতে বিনিয়োগের তুলনায় বেসরকারি শিল্পখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে ৪ গুণ, তখন বাস্তবে ঘটলো ঠিক উল্টোটি। বিকশিত হ'ল বাণিজ্য ও সেবা খাত; আর শিল্প খাতের মধ্যে রপ্তানিমুখী হালকা প্রযুক্তি নির্ভর শ্রমঘন ঠিকাদারি গোছের দোকানদারি শিল্প। নিকৃষ্ট পুঁজি বিকাশের এ আর এক নমুনা।

চার. বিকাশের ধারাটি আমাদের এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে, এখন শিল্পের চেয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য লাভজনক, আর ব্যবসার চেয়ে লাভজনক চোরাচালান । সুতরাং পুঁজির গতিমুখ চোরাচালানমুখী– শিল্পায়নমুখী নয়। এ কোন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা উদ্ভূত পরিস্থিতি?

পাঁচ. শিল্প খাতে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ শিল্পমুখী কিনা– সে কথাও প্রশ্নসাপেক্ষ। বিদেশি পুঁজির বড়জোর ২৫ শতাংশ বিনিয়োগ হচ্ছে শিল্পখাতে, আর কমপক্ষে ৭০ শতাংশ ব্যবসায়ে। সেই সঙ্গে মারপ্যাঁচের বিষয় হ'ল– বিদেশি পুঁজি বিদেশাগত কি না (না কি পূর্বে বিনিয়োজিত পুঁজির আয়), মূলধনী দ্রব্যাদির আমদানি কতটুকু ইত্যাদি। প্রশ্নগুলি উত্থাপন করা জরুরি অন্তত এজন্য যে, ভবিষ্যতে তেল-গ্যাস খাতে যে বিদেশি বিনিয়োগ হতে পারে তার ৮০-৯০ ভাগ দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে– এ নিশ্চয়তা নেই। বৈদেশিক পুঁজির সরাসরি বিনিয়োগ বছরে প্রায় ১৬ কোটি ডলার (দক্ষিণ এশিয়ায় সর্ব নিম্ন– নেপাল ছাড়া) অথচ প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ১৮৮ কোটি ডলার। আশাব্যাঞ্জক ঘটনা, কিন্তু হুন্ডিসহ বিভিন্ন মুদ্রা পাচার সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের শক্ত ভিত্তি এ ক্ষেত্রেও দুর্বৃত্তায়ন বৃদ্ধি করছে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন কারণে বৈদেশিক বিনিয়োগ সম্ভাবনাও ক্ষীণ।[১৩] পাশাপাশি একথাও নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, নিজস্ব অর্থনীতির ভিত্তি (শিল্পায়ন যার অন্যতম প্রধান মানদণ্ড) দুর্বল হলে বৈদেশিক বিনিয়োগও অলাভজনক হতে পারে। সুতরাং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ অর্থনীতির ভিত না গড়তে পারলে অগ্রসর হওয়া যাবে না।

[১৩] উল্লেখ্য যে, বিশ্বায়নের কারণেই বিনিয়োগকারীরা চাইবেন যথার্থ বিনিয়োগ পরিবেশ। এ জন্য যে তেরোটি বিষয় নিশ্চিত করতে হবে, তার প্রথমটি বাদে অন্য কোনটি বাংলাদেশে নেই। প্রথমটি, অর্থাৎ স্বল্প মজুরে শ্রম আমাদের একমাত্র সুবিধার দিক। এ ছাড়া কাঁচামাল, অবকাঠামো, বিভিন্ন ধরনের শুল্ক ও করভার, শ্রমঅসন্তোষমুক্ত পরিবেশ, কাগজপত্রের দ্রুত চলাচলের নিশ্চয়তা, উন্নত ব্যাংকিং ব্যবস্থা, দুর্নীতিহীনতা বা স্বল্প দুর্নীতি, আইনশৃঙ্খলা, সুশাসন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, সর্বোচ্চ মুনাফা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা, মুনাফা ইচ্ছামাফিক ব্যবহারের পরিবেশ–এ বারোটি বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থা নেতিবাচক। আবার এ কথাও সত্য যে, অনেক ক্ষেত্রে অস্বচ্ছ পরিবেশে বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিত হয়।

ছয়. শিল্প বিকাশে সরকারি অবহেলার সবচে' উৎকট উদাহরণ দেখা যায় ক্ষুদ্র শিল্পে যা এ দেশের নিজস্ব, সৃজনশীল, গতিশীল। এসব শিল্প পারিবারিক শ্রম ভিত্তিক এবং স্থানীয় চাহিদা মেটাতে সক্ষম। অথচ এরা সব ধরণের সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত। [14]অবাধ আমদানি যেমন এসব ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য ক্ষতিকর, তেমনি মুদ্রা-অবমূল্যায়নের ফলে যে রফতানি হয়, সেক্ষেত্রেও এদের ক্ষতি। বিশ্বায়নের তোড়ে দেশজ এসব ক্ষুদ্র পারিবারিক সৃজনশীল শিল্প চূর্ণ-বিচূর্ণ হবার আশঙ্কা আছে। এক্ষেত্রে এখন থেকে ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতে বড় ধরনের বিপর্যয় অনিবার্য।

সাত. আমাদের দেশে শিল্প খাতে গঠনগত পরিবর্তনের ফলে রপ্তানি বাণিজ্যে পরিবর্তন ঘটেছে। রপ্তানি কমেছে প্রাথমিক পণ্যের, আর বৃদ্ধি পেয়েছে সংকীর্ণ ভিত্তির প্রক্রিয়াজাতকরণ পণ্যের। রপ্তানি আয়ের উৎসগত দিক থেকে পাট, পাটজাতদ্রব্য ও চা-এর বিলুপ্তি ঘটেছে বলা চলে; আর বৃদ্ধি পেয়েছে তৈরি পোশাক খাতে। অর্থাৎ তৈরি পোশাক শিল্পকে শিল্প খাতে না ধরলে রপ্তানি আয়ে শিল্পের অবদান হ্রাস পাবে। শুল্ক ও কোটামুক্ত বিশ্বায়নে অগ্র-পশ্চাদ্ সংযোগ শিল্পের অনুপস্থিতিতে আমাদের তৈরি পোশাক শিল্প ভিত্তিক রপ্তানি বাণিজ্যে যে বড় ধরণের ধস নামতে পারে (২০০৪-এর পরে), এ বিষয়ে ভাবনার যথেষ্ট অবকাশ আছে (বিষয়টি পরে বিশ্লেষিত হয়েছে)। সক্রিয়ভাবে ভাবতে হবে করণীয় বিষয়াদি যার ফলে রপ্তানি শিল্পে বহুমাত্রিকিকরণ সম্ভব এবং রপ্তানি পোশাক শিল্পে নিম্নস্তরের মধ্যস্থতাকারী থেকে উচ্চতর স্তরে উত্তরণ সম্ভব।

ব্যাংক-বীমা, মূলধন বাজার, বাণিজ্য : জন-কল্যাণের সঙ্গে সম্পর্কহীন অর্থনৈতিক বিকৃতির উৎস

গত তিন দশকে ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানের বিকাশের সঙ্গে ইতোমধ্যে বিশ্লেষিত শিল্পখাতের গুণগত বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। এসবই নানা ধরনের অর্থনৈতিক বিকৃতি (economic distortions) ও অসম্ভাব্যতা (uncertainties)-র উৎস, যা রাজনৈতিক বিকৃতিকে উৎসাহিত করে। ৮০-র দশকের বিরাষ্ট্রীয়কৃত ব্যাংকের সঙ্গে ঋণখেলাপিরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। খেলাপি ঋণের পরিমাণ সংজ্ঞাভেদে এখন ৩০ হাজার থেকে ৪০ হাজার কোটি টাকা। এসকল ঋণখেলাপির ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পরিচয়ের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের সম্পর্কটা এখন সরাসরি। এ সম্পর্কে রূপান্তরের পর্যায়টা এখন এমন যে, তারা জাতীয় নির্বাচনে অধিকহারে অংশগ্রহণের মাধ্যমে 'গণতান্ত্রিক'- ভাবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ সংস্থা জাতীয় সংসদে পৌঁছে গেছেন; হয়ত বা লক্ষ্য হ'ল জাতীয় সংসদে সংখ্যাধিক্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাজনৈতিকভাবে নিয়ামক শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়া। মহান মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্যের সাথে এসব সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী।

আর্থিক-খাতে সংস্কারের কথাবার্তা নতুন নয়। দাতাগোষ্ঠি (অনেকে বলেন উন্নয়ন সহযোগী) ও সরকার (অতীত ও বর্তমান) এ বিষয়ে যাই করুন না কেন, ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি অথবা করতে সাহস করেননি, যদিও একাধিকবার বিভিন্ন কারণে তাদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে; সরকার কেন যেন লাভজনক ব্যাংকগুলো বেসরকারি খাতে ছেড়ে দিতে আর ব্যক্তিমালিকানাধীন রুগ্ণ ব্যাংকগুলোকে বিশেষ আর্থিক সুবিধা দিতে অত্যুৎসাহি। সেই সঙ্গে অবিরাম মুদ্রার অবমূল্যায়ন, নমনীয় বিনিময় হার, টাকার সহজ রূপান্তরযোগ্যতা ইত্যকার বিষয়াদি যে কিভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষমতাহীন জনগোষ্ঠির জন্য কল্যাণকর হতে পারে, এ বিষয়টি কোনও সরকারই কখনও স্পষ্টভাবে বলেননি। অবস্থাটা এমনও হতে পারে যে, যেহেতু আর্থিক খাতের সংস্কারসমূহ জনগণের কল্যাণ উদ্দিষ্ট নয়, সেহেতু বিষয়টির সঙ্গে বৃহৎ জনগোষ্ঠির স্বার্থসংশ্লিষ্টতা উত্থাপন না করাটাই সমীচীন বলে মনে করেছেন অতীতের অর্থমন্ত্রীরা।

[14] এ বিষয়ে সাম্প্রতিক উদাহরণ হ'ল দেশজ ১১ হাজার পোল্ট্রি ফার্মের নিঃস্বায়ন, যা ইতোমধ্যে 'কৃষির ভিক্ষুকায়ন' অনুচ্ছেদের পাদটিকায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গত তিন দশকে মূলধনী বাজারে মূলধন বেড়েছে, তবে ১৯৯৬ সালে শেয়ার বাজারের বুম (১৫ অক্টোবর থেকে ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত) পরবর্তী ধস'কে প্রকৃত অর্থেই 'নিরীহদের গণহত্যা'' হিসেবে অভিহিত করা যায়। ১৯৯৬-এর বুমকালীন শেয়ার সূচক তিন হাজার ৬০০ এবং মূলধন ২৪ হাজার কোটি টাকা থেকে নামতে নামতে এখন এসে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৮১৮ এবং ছয় হাজার ১৭২ কোটি টাকায়। মূলধন বাজার সৃষ্টির নামে নিরীহ মানুষের তিলে তিলে সঞ্চিত অর্থ এক নিমেষে বেহাত করা হলো। দেশি-বিদেশি দালাল পুঁজির স্বার্থে ঘটে যাওয়া নীরব বিপ্লবের ফলে লাখ লাখ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষ নিঃস্বায়নের শিকার হলেন– এ নিয়ে কারও কোনো মাথা ব্যথা নেই। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আমাদের মত অবিকশিত বাজারের শেয়ার মার্কেটে কেন বিনিয়োগ করেছিল, সেটাও স্পষ্ট হয়ে গেলো। দুর্বৃত্তায়িত আর্থ-রাজনৈতিক কাঠামোতে এটাও সম্ভবত অভাবিত কোনো বিষয় নয়। এখানে মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষার কবর রচিত হয়েছে।

বাণিজ্য ঘাটতি গত তিন দশকে মোটামুটি অব্যাহত ছিল। বাণিজ্য বেড়েছে ১১ গুণ। আমদানি বাণিজ্যে লক্ষ্যণীয় কাঠামোগত পরিবর্তন তেমন ঘটেনি। আমদানী বাণিজ্য প্রধানত 3F (food-fuel-fertilizer)– খাদ্য, জ্বালানী ও সারের সমাহার মাত্র। সরকারি পরিসংখ্যানে আমদানি বাণিজ্যে ভোগ্য পণ্যের যে আধিক্য দেখানো হয়ে থাকে, চোরাচালানের কারণে সে অনুপাতটা আরও অনেক বেশি হবে। শিল্প খাতে গঠনগত পরিবর্তন হেতু রপ্তানি বাণিজ্যে পরিবর্তন ঘটেছে। রপ্তানি কমেছে প্রাথমিক পণ্যের, আর বৃদ্ধি পেয়েছে সংকীর্ণ ভিত্তির প্রক্রিয়াজাতকরণ পণ্যের। রপ্তানি আয়ের উৎসগত দিক থেকে পাট, পাটজাতদ্রব্য ও চা-এর বিলুপ্তি ঘটেছে বলা চলে; আর বৃদ্ধি পেয়েছে তৈরি পোশাক (যেখানে আবার মূল্য সংযোজন সর্বনিম্ন) খাতে। অর্থাৎ তৈরি পোশাক শিল্পকে যদি শিল্প না বলা হয় (টেইলারিং শপ) সেক্ষেত্রে রপ্তানি আয়ে শিল্পের অবদান হ্রাস পেয়েছে বলতে হয়। শুল্ক ও কোটামুক্ত বিশ্বায়নে আমাদের তৈরি পোশাক শিল্প ভিত্তিক রপ্তানি বাণিজ্যে যে বড় ধরণের ধস নামতে পারে (২০০৪-এর পরে), তা ভেবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। এ বিষয়ে অধ্যাপক রেহমান সোবহানের সাম্প্রতিক গবেষণা ফলাফল বিশেষ গুরুত্ববহ: "By the time of the expiry of the *Multi Fibre Agreement* (MFA) in 2005, Bangladesh will have to establish backward linkages with a modernised textile industry which can produce the yarn and fabric needed to service Bangladesh's RMG sector. Unless Bangladesh can convert its RMG sector from a two-stage processing industry to a three-stage enterprise, after 2005, the *rules of origin* clause in the WTO could deny Bangladesh's RMG exports entry to a large part of their traditional markets in Europe and North America. This involves putting in place, within Bangladesh, a domestic manufacturing capacity to produce 2 billion metres of fabric. This involves setting up around 375 new weaving mills and 290 new spinning mills, involving an investment of around US$ 5 billion. On all counts, making of most optimistic assumptions, Bangladesh's private entrepreneurs expect to mobilise only a fraction of such resources for which they will need to assume the risk taking burden for realising such a volune of investment. In such circumstances should the state remain idle and make no attempt to put any productive capacity in place,, even if this means a loss of RMG markets to India and China who already preside over large integrated textile industries and are planning major investments for the post-MFA era? The failure to address this dilemma provides the source of the present contradictions inherent in Bangladesh's privatisation policy. This could have potentially fatal implications for Bangladesh's future development"[15]। সেই সঙ্গে স্বাধীনতাত্তোর তিন দশকে আমাদের আন্ত র্জাতিক বাণিজ্য সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে যখন বেসরকারি নিয়ন্ত্রণে চলে যায় এবং সরকার যখন আমদানি-রপ্তানির বিভিন্ন বিধিনিষেধ শিথিল বা প্রত্যাহার করে, তখন একদিকে যেমন দেশজ শিল্পের বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত, অন্যদিকে চোরাচালান উৎসাহিত এবং ভোগ্যপণ্য নির্ভর আমদানি উৎসাহিত হবার ফলে কৃষির বিকাশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিষয়গুলি গুরুত্বসহ ভাবতে হবে। কারণ বিশ্বায়নের যুগে একদিকে যেমন স্ব-স্বার্থ প্রতিষ্ঠার জন্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর বাণিজ্যের লড়াইটা সমাসন্ন তেমনি অন্যদিকে ঋণ সাহায্য প্রবাহ ক্রমহ্রাসমান (জিডিপি-র অনুপাতে)।

[১৫] বিস্তারিত দেখুন, Sobhan Rehman, Privatisation in Bangladesh: An Agenda in Search of a Policy, CPD Occasional Paper Series, August 2002: 16-19.

বৈদেশিক ঋণ-অনুদান : রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের উৎসমূল[১৬]

পাকিস্তান আমলে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য যা পাওয়া যেতো তার মাত্র ২০% তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ব্যবহৃত হত। বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য এ দেশের অর্থনীতিতে কোনো অর্থেই পুনরুজ্জীবকের ভূমিকা পালন করেনি। উল্টো তা কাজে লেগেছিল পাকিস্তানী ধনিক শ্রেণীর ক্ষমতাবলয় শক্তিশালী করে নয়া ঔপনিবেশিক বৈশিষ্ট্য দৃঢ়তর করতে। অন্যান্য অনেক কারণের মধ্যে এটাও একটি কারণ যার ফলে স্বাধীনতাত্তোর কালের সরকার পাকিস্তান আমলের বৈদেশিক ধার-দেনার দায়ভার গ্রহণে অস্বীকার করেছিল। অবশ্য পরে ঐ বোঝা বহন না করে উপায় ছিল না।

গত তিন দশকে আমরা সরকারিভাবে প্রায় এক লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা 'ফরেন এইড'[১৭] বা বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান পেয়েছি। মাথাপিছু বৈদেশিক ঋণের দায়ভার দাঁড়ায় ১৯৭৩/৭৪ সালের ৬.৬ ডলার থেকে ১৯৯৮/৯৯ সালে প্রায় ১৮ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১১৬ ডলারে। ১৯৭১/৭২ অর্থবছরে যেখানে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের পরিমাণ ছিল ২৭ কোটি ডলার, তা ১৯৯৮/৯৯ অর্থবছরে এসে দাঁড়িয়েছে এক লাখ ৫৪ কোটি ডলারে, অর্থাৎ ৩০ বছরে প্রায় ৬ গুণ বৃদ্ধি।

বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের প্রবাহে কিছু কাঠামোগত রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য দিকসমূহ নিম্নরূপ:

এক. ঋণ-অনুদান কাঠামোতে পরিবর্তন: গত তিন দশকের মোট প্রাপ্তির প্রায় ৫২ শতাংশ ঋণ ও ৪৮ শতাংশ অনুদান। তুলনামূলক হিসেবে ঋণের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও অনুদানের মাত্রা হ্রাস পেয়েছে। মোট প্রাপ্তিতে যেখানে ১৯৭১/৭২ সালে ঋণের অংশ ছিল আনুমানিক মাত্র ১০ ভাগ, ১৯৯৮/৯৯ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৫৭ ভাগে দাঁড়ায়। অর্থাৎ দাতা গোষ্ঠি বৈদেশিক সাহায্যের প্রাথমিক পর্যায়ে অনুদান দিয়ে শুরু করলেও পরে ক্রমশ ঋণের জাল সম্প্রসারিত করেছেন। শুধু তাই নয়, উত্তরোত্তর ঐ ঋণজাল হয়েছে অধিকতর শর্ত-জালের ঋণ (tied loan)। আর শর্ত-জালের ঋণ আমাদের দেশে নির্ভরশীল ও ভাড়াটে অর্থনীতির একটা কাঠামো সৃষ্টি করেছে বলা যায়।

দুই. ঋণ-অনুদানে খাতওয়ারি পরিবর্তন: বেশ দীর্ঘকাল মোট বৈদেশিক সাহায্যে প্রকল্প খাতের বিপরীতে খাদ্য ও পণ্যখাতের আধিক্য থাকলেও উত্তরোত্তর প্রকল্প খাতই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে, যেমন ১৯৭২/৭৩ সালে, মোট বৈদেশিক সাহায্যের ৮৫ শতাংশই ছিল খাদ্য

[১৬] এ অনুচ্ছেদের বিষয়াদি বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত, 'বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য কতখানি প্রয়োজন: গত তিন দশকের অভিজ্ঞতার পলিটিক্যাল ইকনমি,' বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, জাতীয় সেমিনার, ঢাকা : ১০ ফেব্রুয়ারী ২০০১।

[১৭] 'ফরেন এইড' টার্মিনোলজির প্রতিশব্দ ও সারার্থ সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা উচিত। 'ফরেন এইড'-এর বঙ্গানুবাদ করা হয় বৈদেশিক সাহায্য। আবার 'ফরেন এইডের' অন্তর্গত উপাদান হল ঋণ (loan) ও অনুদান (grant), যেখানে অনুদানকে হয়ত বা 'সাহায্য' অভিধায় অভিহিত করা যেতে পারে। 'হয়ত বা' এজন্য বলছি যে, cross-conditionalities-এর কারণে অনেক ক্ষেত্রেই একটি বিশেষ অনুদান অন্য আর একটি অনুদান এবং/অথবা ঋণের শর্ত হিসেবে কাজ করে। এ কারণেই শিরোনাম বড়জোর হতে পারে 'ঋণ ও সাহায্য' (loan and grant/aid)। কিন্তু প্রকৃত অর্থে 'ঋণ' নামক প্রপঞ্চটির উপস্থিতি ও অনুদানে নিহিত শর্তের কারণে 'ফরেন এইড'-এর বঙ্গানুবাদ বৈদেশিক সাহায্য হওয়া যথার্থ নয়। তথাপি প্রচলিত ধারণার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার স্বার্থে আমরা ফরেন এইড-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে বৈদেশিক সাহায্যকে গ্রহণ ও ব্যবহার করেছি। আলোচনার সুবিধের জন্য ক্ষেত্র বিশেষে ফরেন এইড বলতে আমরা 'বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য' বা বৈদেশিক ঋণ-অনুদান টার্ম ব্যবহার করেছি। ফরেন এইড-আসলে 'সমগ্র শিল্প' (Aid as Industry) এবং সেইসঙ্গে নির্ভরশীলতার সংস্কৃতির (culture of dependency) ভিত্তি ও বাহন। 'ফরেন এইড' হ'ল দাতাগোষ্ঠি (কেন্দ্র) কর্তৃক গ্রহিতাকে (প্রান্ত) একটি নির্ভরশীল কাঠামোর মধ্যে পরিচালনের শিল্প। 'ফরেন এইড' শিল্পটি দাতাগোষ্ঠীর স্বার্থে একটি সূক্ষ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সচেতনভাবে পরিচালিত হয়। সেই সঙ্গে 'ফরেন এইড' যেহেতু নির্ভরশীলতার সংস্কৃতি উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন করেই চলেছে সেহেতু আমাদের মানসিক কাঠামো ঠিকঠাক রাখার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নামকরণের ক্ষেত্রেও যে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা হচ্ছে, তা লক্ষ্যণীয়। যেমন, 'ফরেন এইডের' (বৈদেশিক সাহায্য) জায়গায় বলা হচ্ছে 'ডেভেলপমেন্ট এসিস্ট্যান্স' (উন্নয়ন সহযোগিতা), 'ডোনার' (সাহায্যদাতা)-এর জায়গায় বলা হচ্ছে 'ডেভেলপমেন্ট পার্টনার' (উন্নয়ন সহযোগী), 'এক্সটারনাল রিসোর্সেস ডিভিশন'-এর জায়গায় বলা হচ্ছে 'ইকনমিক রিলেশন্স ডিভিশন', 'বাংলাদেশ এইড ক্লাবের' জায়গায় বলা হচ্ছে 'বাংলাদেশ ডেভেলাপমেন্ট ফোরাম'।

(৩৩%) ও পণ্য খাতে (৫২%)। পরে এ কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটে। গত ১৫ বছরের প্রবণতা তা-ই নির্দেশ করে। যেমন ১৯৯৭/৯৮ অর্থবছরে মোট বৈদেশিক সাহায্যের ৮৩ ভাগই এসেছে প্রকল্প খাতে। আর প্রকল্প খাতে শর্ত-জালের বেষ্টনী যত শক্তভাবে কাজ করে, অন্য কিছুতেই তা করে না।

তিন. সাহায্যের উৎসগত পরিবর্তন: উৎসগত দিক থেকে দ্বিপাক্ষিক দাতার (bilateral donors) বিপরীতে বহুপক্ষীয় দাতা (multilateral donors) প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বিপাক্ষিক দাতার বিপরীতে বহুপক্ষীয় দাতাগোষ্ঠি অপেক্ষাকৃত অধিক অনড় ও পারঙ্গম। আর তাই দেখা যাচ্ছে যে– উল্লিখিত শর্ত-জালের কর্মকৌশল অধিকতর ফলপ্রদ করার স্বার্থে উত্তরোত্তর দ্বিপাক্ষিক সাহায্যের বিপরীতে বহুপক্ষীয় দাতাদের ভূমিকা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৪-৮৪ কাল-পর্বে বহুপক্ষীয় দাতা সংস্থা মোট সাহায্যের আনুমানিক ৩০ ভাগের উৎস হিসেবে কাজ করতো, আর এখন এটা এসে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬০ ভাগে।

ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক ঋণ আমাদের ঋণগ্রস্ততা বৃদ্ধি করেছে। ঋণের পরিমাণ, গ্রেস পিরিয়ড পার হয়ে যাওয়া এবং প্রতিকূল বিনিময় হার ক্রমান্বয়ে আমাদের পরিশোধিতব্য ঋণের (debt service payment) বোঝা বৃদ্ধি করছে। যেমন, ১৯৭২/৭৩ সালে আমাদের মোট অপরিশোধিত ঋণের বোঝা ছিল ৬.৫ কোটি ডলার, ১৯৯৮/৯৯ সালে তার পরিমাণ ১৮৩৫ কোটি ডলার। ঋণের কিস্তি ও সুদ প্রদানের পরিমাণ ১৯৭৩/৭৪-এ দুই কোটি ডলার থেকে ১৯৯৮/৯৯ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়েছে ৭৭ কোটি ডলারে। গত তিন দশকে ঋণের কিস্তি ও সুদ পরিশোধে ব্যয় হয়েছে ৬১৮ কোটি ডলার (প্রায় ৬৪% মূল কিস্তি বাবদ ও ৩৬% সুদ বাবদ)। ১৯৯৮/৯৯ সালে ঋণের কিস্তি ও সুদ পরিশোধে যে অর্থ ব্যয় হয়েছে তা আমাদের মোট বাণিজ্যিক রপ্তানির (merchandise export) ১৪.৫%, মোট পণ্য ও সেবা রপ্তানি আয়ের (শ্রমশক্তি রপ্তানির আয়সহ) ১০% এবং জিডিপি-র ২.১%।

গত তিন দশকে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য প্রবাহ যে বাংলাদেশে সামগ্রিক মানব উন্নয়ন ত্বরান্বিত করেছে, এখন পর্যন্ত কোনো উন্নয়ন গবেষণায় এমনটি প্রমাণিত হয়নি। অর্থাৎ আমরা কোনো অর্থেই এখনও বলতে পারি না যে, বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের প্রবাহ আমাদের দেশের জনগণের জন্য পাঁচ ধরণের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে, যার অন্তর্ভূক্ত হ'ল অর্থনৈতিক সুযোগ, সামাজিক সুবিধাদি, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, স্বচ্ছতার গ্যারান্টি এবং সুরক্ষার নিশ্চয়তা। প্রকৃত অর্থে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য প্রবাহের সঙ্গে উল্লিখিত পাঁচ ধরণের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের কোনো সম্পর্ক নেই। এমনও হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, বৈদেশিক সাহায্য প্রবাহের সঙ্গে ঐসব স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের সম্পর্কটি ঋণাত্মক। বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের বঞ্চনার মাত্রাসমূহ (যা পরবর্তী ব্যালান্স-শিটে দেখানো হয়েছে) অন্তত তা-ই নির্দেশ করে।

মানব উন্নয়নের স্বাধীনতা মধ্যস্থতাকারী ধারণার সঙ্গে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য প্রবাহের সম্পর্ক নির্ধারণে অর্থনীতিবিদদের অনেকেরই দ্বিমত থাকতে পারে। অনেকেই মনে করেন, উক্ত ঋণ-সাহায্য প্রবাহ অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP) বৃদ্ধিতে সাহায্য করার মাধ্যমে অন্তত 'চুইয়ে পড়া' (trickle down) উপযোগ সৃষ্টি করে। এ বিষয়ে আমরা পরিসংখ্যানগত সহ-সম্পর্ক নির্ধারণে যা দেখি তা কোনোভাবেই ঐ ধারনা সমর্থন করে না। ১৯৭৮-৯৯-এর পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে জিডিপি প্রবৃদ্ধির (নির্ভরশীল চলক) সঙ্গে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য প্রবাহের (স্বাধীন চলক) সহসম্পর্ক সহগ হ'ল ০.২৭, যা ১৯৮২-৯১-এ ০.১৯ ও ১৯৯১-৯৯-এ-০.৭১। অর্থাৎ জিডিপি-র প্রবৃদ্ধি বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য প্রবাহের উপর নির্ভরশীল নয়। আর ৯০-এর দশকের ঋণাত্মক নির্ভরশীলতা সম্ভবত এটাই নির্দেশ করে যে, বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য বন্ধ হয়ে গেলেও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মোটেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। প্যারিস কনসোর্টিয়াম আর আইএমএফ/বিশ্ব ব্যাংকের মিটিং থেকে ফিরে এসে অর্থমন্ত্রী মহোদয়ও একই ধরণের কথা বলেছেন (কারণ অজ্ঞাত)।

আনুষ্ঠানিকভাবে এটাই বলা হয় যে, বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা এত গভীর এবং সর্বব্যাপী যে, বিপুল অঙ্কের সাহায্য প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি না পাওয়া গেলে আমাদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (এডিপি) রচনা রীতিমত অসম্ভব। আসলে নির্ভরশীলতার এই মাত্রা যে আমাদের উন্নয়ন তাগিদ থেকেই উৎসারিত— এ কথা সত্য নয়। বহু অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প 'অদৃশ্য হাত' (invisible hand) মারফত আমাদের এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সম্ভবত কারণটি এমন যে, ফরেন এইড শিল্পে মধ্যবর্তী পর্যায়ে এমন কেউ রয়েছেন যিনি বা যারা এই সাহায্যপ্রাপ্তি থেকে ব্যাপক সুবিধা আদায় করে থাকেন। এমনকি সাহায্য-নির্ভর প্রকল্পে এমন বেশ কিছু উপাদান সংযুক্ত হয় যেগুলো সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়— যেমন যানবাহন, অফিস সামগ্রী, পরামর্শদাতা এবং বিদেশ ভ্রমণ। যন্ত্র বা সরঞ্জামাদি বাছাই এবং প্রযুক্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রেও আমাদের স্বাধীনতা থাকে না। প্রকল্প চয়নের ক্ষেত্রে আমাদের স্বকীয় অগ্রাধিকারের বিষয়টি গুরুত্ব পায় না আদৌ। প্রতিকূল শর্তাদি ও ক্রস-শর্তাদির বিষয়টি এখন সরকারিভাবেই স্বীকৃত[১৮]। এখানে বলা সঙ্গত যে, বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য প্রাপ্তির তিন দশক পরে ইদানিং আমরা যে অসমাপ্ত, অর্ধসমাপ্ত, পরিত্যক্ত, এবং ক্ষতিকর প্রকল্পসমূহের কল্পনাতীত দায়ভার বহন করতে বাধ্য হচ্ছি তা 'সাহায্য' উদ্ভুত বিভিন্ন ধরণের নির্ভরশীলতা ও বাধ্যবাধকতার আওতায় উল্লিখিত 'অদৃশ্য হাতের' কারসাজি, প্রযুক্তি হস্তান্তরের নামে পুরাতন অকেজো ও বাতিল যন্ত্রপাতি ও know how পাচারের সক্রিয় প্রচেষ্টা, প্রকল্প চয়নে জাতীয় অগ্রাধিকারের গুরুত্বহীনতা— এসবেরই ঘনীভূত প্রকাশ মাত্র।

স্বাধীনতাত্তোর কালে ভোগের ক্ষেত্রে বিদেশি যে সাহায্য-নির্ভরতা সৃষ্টি হয়েছে, তা মূলত কাঠামোগত ব্যর্থতার পরিণতি। ভাল ফসল হয়েছে এমন বছরেও বাংলাদেশ সরকার অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ প্রচেষ্টায় এক লাখ টনের বেশি খাদ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়নি। এমনকি খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের পরেও অবস্থার হয়নি তেমন কোনো পরিবর্তন । ফলত মূল্য স্থিতিশীল রাখা, দুর্ভিক্ষ এড়ানো এবং দুর্বৃত্তদের কমিশন ব্যবসা চাঙ্গা রাখতে আমাদের খাদ্য-সাহায্য প্রার্থনা করতে হয়। আমরা বস্ত্র উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাহায্য কামনা করি, অথচ বিদ্যমান উৎপাদন ক্ষমতারই পূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে না। অধিকাংশ চালু বস্ত্রশিল্প লোকসান দিচ্ছে, তাঁতীরা তাঁত ছেড়ে দিচ্ছেন এবং কোনো রকমে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখছেন। আমরা শিল্প-কল-কারখানা বন্ধ করছি আর সেই সঙ্গে পাইপ-লাইনে গ্যাস পাচারে সংকল্পবদ্ধ।

শহুরে উচ্চ আয়ের লোকদের চল্তি ভোগ বাজেটের ৪০ শতাংশ বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। সে তুলনায় গ্রাম এলাকার দরিদ্রতম পরিবারগুলোর ক্ষেত্রে এই নির্ভরশীলতা মাত্র ১৪ শতাংশ। চরম প্রান্তে, শহুরে এলিটগোষ্ঠির ভোগের ধরনটি অত্যন্ত আমদানি-ঘন। আমদানি-ঘন এই ভোগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাদের পোশাক পরিচ্ছদ, বাসস্থান, ভোগ্যপণ্য, বিদেশ ভ্রমণ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে । আমদানিকৃত ভোগ্যপণ্যের একটি বৃহৎ অংশের মধ্যে সাহায্য কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত থাকে যা প্রধানত সমাজের উচ্চস্তরের ব্যক্তিরাই আত্মসাৎ করেন। বৈদেশিক সাহায্যকে আমদানিকৃত বিলাসবহুল ভোগের উদ্দেশ্যে চালিত করার বিষয়টিকে ব্যাপক অপচয়ের উৎস হিসেবেই গণ্য করা উচিত। বৈদেশিক সাহায্যের অর্থে গঠিত উন্নয়নধর্মী অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহ (DFI) বেসরকারি ঋণ গ্রহীতাদের সূত্রে অপচয়ের আর একটি উৎস হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। ডিএফআই তহবিলসমূহ ব্যাঙ্ক একাউন্ট-এ জায়গা করে নেয়, যেগুলো আবার এই শ্রেণীর ঋণ গ্রহীতাদের আমদানিকৃত ভোগের অর্থ যোগান দেয়। এ ধরনের তহবিল আমদানিকৃত ভোগ্যপণ্য, এমনকি বিলাসবহুল বাসস্থান সামগ্রীর জন্যেও ব্যবহৃত হয়, যেগুলোর আমদানি-ঘনত্বের মাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি। সবশেষে, বাংলাদেশে প্রতিবছর যে পরিমাণ কালোটাকা সৃষ্টি হয়— বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের সঙ্গেও তার কার্যকারণ সম্পর্ক বিদ্যমান। সুতরাং সমগ্র বিদেশি ঋণ-সাহায্য কাঠামো আমাদের দেশে আত্মঘাতী লুণ্ঠন সংস্কৃতিকে শক্তিশালী করেছে— এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। অন্যদিকে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের দীর্ঘমেয়াদী

[১৮] বিস্তারিত দেখুন, External Resources Division, Flow of External Resources, 2000 : XXI

অভিঘাত সমগ্র অর্থনীতি, রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় দুর্নীতিকে কালের ব্যাপ্তিতে মূলনীতিতে পরিণত করেছে। এখানেই অতীতের ঋণ সাহায্যের সঙ্গে ভবিষ্যতের সুস্পষ্ট যোগসূত্র।

গত তিন দশকে সরকারিভাবে প্রাপ্ত এক লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের সুবিধাভোগী কারা? এক হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে, গত তিন দশকে বিদেশের যন্ত্রপাতি সরবরাহকারি এজেন্ট ও পরামর্শকেরা সম্মিলিতভাবে মোট সাহায্যের ২৫ শতাংশ অর্থাৎ ৪৫ হাজার কোটি টাকা লুটপাট করেছেন। দেশের ভিতরের আমলা-রাজনীতিবিদ (বখরা হিসেবে), কমিশন এজেন্ট, পরামর্শক ও নির্মাণ ঠিকাদাররা হাতিয়ে নিয়েছেন মোট সাহায্যের ৩০ শতাংশ অর্থাৎ ৫৪ হাজার কোটি টাকা। দেশের শহুরে ও গ্রামীণ ধনী ব্যক্তিরা (উচ্চ মধ্যবিত্তসহ) পেয়েছেন ২০ শতাংশ বা ৩৬ হাজার কোটি টাকা। আর মূলত যাদের নামে সাহায্য এসেছে, সেই গরীব শ্রমজীবী মানুষ পেয়েছেন মাত্র ২৫ শতাংশ অর্থাৎ ৪৫ হাজার কোটি টাকা। সুতরাং অন্যভাবে বলা যায় যে, গত তিন দশকে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের নামে ৪৫ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে এক লাখ ৩৫ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ ধনস্ফীতির (লুটপাটের) একটি সংগঠিত পথ সৃষ্টি করা হয়েছে— সৃষ্টি হয়েছে দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদ।

বৈদেশিক সাহায্যের একটি বৃহৎ অংশ ব্যয় হয় দেশের বাইরে থেকে আনা পণ্য এবং পরিসেবার ব্যয় পরিশোধের জন্যে। এভাবে যন্ত্রপাতি (equipment) সরবরাহকারি এবং বিদেশি পরামর্শদাতার একটি দেশ-বহির্ভূত শ্রেণী বিদেশি সাহায্যের সরাসরি সুবিধাভোগী হিসেবে গড়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে আমাদের দেশের মধ্যেই গড়ে উঠেছে স্থানীয় সুবিধাভোগীদের একটি দুর্বৃত্ত চক্র। বৈদেশিক সাহায্য-নির্ভর ব্যয়ের ওপর তাদের রয়েছে সরাসরি স্বার্থ। এই চক্রে আছেন স্থানীয় উদ্যোক্তা, বৈদেশিক সাহায্যের অর্থে আমদানিকৃত পণ্য ও পরিসেবার মধ্যস্বত্বভোগী বা কমিশন এজেন্ট, নির্মাণ ঠিকাদার, ডিএফআইসমূহ থেকে ঋণ গ্রহীতাগণ, বিদেশি সরবরাহকারিদের কাছ থেকে অবৈধ বখরাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আমলা) ও রাজনীতিবিদ। এভাবে তিন দশকে বছরে বৈদেশিক সাহায্যের লুটপাটকেন্দ্রিক একটি গোষ্ঠি ইতোমধ্যে গড়ে উঠেছে, যেখানে আছে ব্যবসায়ী, আমলা, রাজনীতিবিদ। গুটিকয়েক ব্যক্তির হাতে স্বাধীনতাত্তোরকালে যে সম্পদ ঘনীভূত হয়েছে, তার হয়ত বা ৭৫ শতাংশের উৎস বিদেশি ঋণ-সাহায্য। শেষ পর্যন্ত বিদেশে পুঁজি পাচার, দৃষ্টিকটু ভোগ, জমি ও বাড়ী ক্রয়, উৎপাদন ক্ষমতার অপর্যাপ্ত ব্যবহার, উদ্বৃত্ত এবং পুনর্বিনিয়োগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিুহার, ডিএফআই এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের কাছে প্রভূত পরিমাণ অপরিশোধিত ঋণ প্রভৃতি এই পরজীবী শ্রেণীর অস্তিত্বের সামাজিক উপযোগিতা সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। বাংলাদেশের আর্থ-রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এই পরজীবী শ্রেণীর ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়িত।

বাংলাদেশে তিন দশকে বছরে আসা 'ফরেন এইড' (ঋণ ও অনুদান) সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেনি। মানব উন্নয়নের মধ্যস্থতাকারী পাঁচ ধরণের স্বাধীনতাসহ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বহিস্থের অন্তর্ভুক্তিকরণ "inclusion of the excluded" নিশ্চিত করতে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের ভূমিকা প্রশ্ন সাপেক্ষ। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে ঐ ঋণ-সাহায্যের ভূমিকা নেই। 'উন্নয়ন' বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের লক্ষ্য নয়— উপলক্ষ্য মাত্র। বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য তার অন্তর্নিহিত লক্ষ্যের মাধ্যমে আমাদের দেশে স্বকীয় সার্বভৌম আর্থ-সামাজিক কাঠামো বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। গত তিন দশকে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যে যে কাঠামোগত রূপান্তর ঘটেছে, তা দাতাগোষ্ঠির স্বার্থেই ঘটেছে। ক্রমশ বেশি অগ্রাধিকার পেয়েছে শর্ত-বন্ধন কণ্টকিত প্রকল্প ঋণ। দাতাগোষ্ঠি উত্তরোত্তর অধিক হারে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির সরাসরি নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। 'ফরেন এইড' নামক শিল্পটি একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেশজ ও বিদেশি এলিটশ্রেণীর জীবনযাত্রা, মান-মর্যাদা ও ক্ষমতা চিরস্থায়ীকরণে সহায়তা করেছে। প্রবাহিত এক লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকার মধ্যে এক লাখ ৩৫ হাজার কোটি টাকা এলিটগোষ্ঠির ধনস্ফীতিতে কাজে লেগেছে। ফলে অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছে, যার স্থায়ীকরণে দুর্বৃত্তায়িত হয়েছে রাজনীতি।

কালো অর্থনীতি : সর্বশক্তিমান খাত

গত তিন দশকে অর্থনৈতিক বিকাশে সবচেয়ে শক্তিশালী খাত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে কালো অর্থনীতি। এ অর্থনীতির অনেক নাম– ভূগর্ভস্থ (subteranean or underground) অর্থনীতি, লুকায়িত (hidden) অর্থনীতি, ছায়াচ্ছন্ন (shadow) অর্থনীতি, জলমগ্ন (submerged) অর্থনীতি, সমান্তরাল (parallel) অর্থনীতি, গোধুলি (grey) অর্থনীতি, দ্বিতীয় স্তরের (second line) অর্থনীতি ইত্যাদি। একই 'কালো অর্থনীতি' বুঝাতে যত ধরণের শব্দই ব্যবহৃত হোক না কেন, কালো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হ'ল সেই সকল লেনদেন (transactions) যা দেশের প্রচলিত নিয়মকানুন বিরোধী। কালো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যে সকল লেনদেনের সঙ্গে সরকারি বিধির অসঙ্গতিপূর্ণ অথবা উক্ত কর্মকাণ্ড যে সকল বিধিকে উপেক্ষা করে, সেগুলো হ'ল প্রধানত শুল্ক ও কর বিধি, লাইসেন্সিং নিয়মকানুন, শ্রম স্ট্যান্ডার্ড ইত্যাদি। কালো অর্থনীতিক কর্মকাণ্ড উদ্ভুত কালো টাকা অবৈধ এবং তা অধিকাংশক্ষেত্রে অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করা হয়।

কালো অর্থনীতির বিপরীতে আমরা সাধারণত যে অর্থনীতির কথা বলি, তা হ'ল বৈধ, প্রচলিত, আনুষ্ঠানিক অর্থনীতি। প্রচলিত (conventional) অর্থনীতিতে যে সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও লেনদনের প্রচলন আছে তার তুলনায় কালো অর্থনীতির লেনদেনের কিছু মৌলিক পার্থক্য লক্ষণীয়। প্রথমত কালো অর্থনীতির লেনদেন অনিয়ন্ত্রিত (unregulated); দ্বিতীয়ত কালো অর্থনীতির লেনদেন করারোপিত নয় (untaxed); তৃতীয়ত তা পরিমাপ করা হয় না (unmeasured), কারণ ঐ সকল লেনদেন নথিভূক্ত নয় (working off the books)। আর এসব কারণেই কালো টাকার পরিমাণ এবং কালো অর্থনীতির বিস্তৃতি নিরূপণ দুঃসাধ্য ব্যাপার।

বাংলাদেশে কোটিপতিদের পুঁজির আদি সঞ্চয়নও হয়েছে অবৈধ পথে, কালো টাকার মাধ্যমে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যে, বৈধ পথে কোটিপতি হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। বাংলাদেশে কোটিপতি হবার পথগুলো নিম্নরূপ:

এক. সরকারি তহবিল, ষ্টোর ও পতিত সম্পত্তি আত্মসাৎ ও দখল করা এবং আমলাদের ক্ষেত্রে পারিতোষিক গ্রহণ।

দুই. চোরাচালান, মাদক ব্যবসা , মজুতদারী, কালোবাজারী, বিদেশি মুদ্রার অবৈধ ব্যবসা এবং আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে আন্ডার (অথাৎ বেশি পণ্য পাঠিয়ে কম দেখিয়ে কর ফাঁকি) ও ওভার ইনভয়েসিং (অথাৎ কম পণ্য কিনে কম দেখিয়ে কর ফাঁকি) ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্ক।

তিন. জাতীয়করণকৃত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে গৃহীত বিশাল পরিমাণের ঋণ পরিশোধ না করা।

চার. রাষ্ট্রের সহায়তায় বিদেশি অর্থায়নে বহু মিলিয়ন ডলার প্রকল্পের কমিশন এজেন্সী এবং বিভিন্ন ক্রয় কাজের সঙ্গে সম্পর্ক।

পাঁচ. পারমিট-লাইসেন্স কেনাবেচা, নিজের পক্ষে আইন প্রয়োগ ও পণ্য-দ্রব্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির মাধ্যমে অনুপার্জিত আয় করা।

উল্লিখিত পাঁচটি পথ, যার ঘনীভূত প্রকাশ-প্রত্যয় 'লুটতরাজ'-ই আমাদের দেশে কোটিপতি হওয়ার প্রধান পদ্ধতি। এই অর্থে 'কোটিপতি' ও 'কালো টাকার মালিক' সমার্থক ধারণা মাত্র। আসলে কালো টাকার উৎপত্তি উৎসকে পরস্পর সম্পর্কিত দু'টি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: প্রথমটি হ'ল 'বৈধ কর্মকাণ্ড উদ্ভুত কালো

টাকা' যা সাধারণ কালো আয় সৃষ্টি করে এবং দ্বিতীয়টি 'অবৈধ কর্মকাণ্ড উদ্ভুত কালো টাকা' যা চক্রবৃদ্ধি হারে কালো আয়ের জন্ম দেয়।

অবৈধ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে সৃষ্টি হয় দ্বিতীয় ধরণের কালো টাকা বা চক্রবৃদ্ধি হারের কালো আয়। অর্থনীতির বৈধ (আইনী) খাতের কর্মকাণ্ডে যখন কর ফাঁকি দেওয়া হয় তখনই সৃষ্টি হয় 'বৈধ কর্মকাণ্ড উদ্ভুত কালো টাকা'। আমাদের দেশে বৈধ কর্মকাণ্ড উদ্ভুত কালো টাকার জন্মক্ষেত্রগুলি নিম্নরূপ:

এক. ইনডেন্টিং, নির্মাণ শিল্পের, জনশক্তি রপ্তানি, ট্রাভেল এজেন্সী, প্রাইভেট ক্লিনিক, ফিল্ম প্রোডাকশন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ উদ্ভূত অত্যুচ্চ রিটার্ন।

দুই. আইনজীবী, প্রাইভেট চিকিৎসক, বিভিন্ন উপদেষ্টা-পরামর্শদাতা, ফিল্মের নায়ক-নায়িকাদের ব্যতিক্রমী অত্যুচ্চ পেশাগত ফিস।

তিন. জমি ও বাড়ির ব্যবসা ও শেয়ার বাজারে সুপার ক্যাপিটাল গেইন ইত্যাদি।

আমাদের দেশে কালো আয়ের মূল ক্ষেত্রগুলো হল: প্রথমত ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বাণিজ্যে আন্ডার ইনভয়েসিং (অথাৎ বেশি পণ্য পাঠিয়ে কম দেখিয়ে কর ফাঁকি) (রপ্তানি) ও ওভার ইনভয়েসিং (অথাৎ কম দামে পণ্য কিনে বেশি দাম দেখিয়ে পাচার পুঁজি) (আমদানি) যার ফলে একদিকে শুল্ক ফাঁকি দেওয়া এবং অন্যদিকে পুঁজি পাচার করা যায়; বৈদেশিক মুদ্রার বেআইনী লেনদেন, চোরাচালানি, ভেজাল ও নকল দ্রব্য প্রস্তুতকরণ, গোপন কারখানা স্থাপন; ওজন ও মাপে কম দেওয়া ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত সার্ভিস খাতে পূর্ব-নির্ধারিত মানদণ্ডের তুলনায় নিচু মানের নির্মাণ কাজ, সিকিউরিটি মার্কেটে অভ্যন্তরীণ ব্যবসা, রেজিস্ট্রেশন ফিস ইত্যাদি ফাঁকি দেবার জন্য সম্পদের (জমি, বাড়ি, গাড়ি ইত্যাদি) দাম কম দেখানো ইত্যাদি। তৃতীয়ত রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ঘুষ, অবৈধ কমিশন প্রাপ্তি, স্বজনপ্রীতির কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যের শেয়ার প্রাপ্তি, রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা। এইসব ক্ষেত্রের কালো টাকা সৃষ্টির প্রক্রিয়া হল নিম্নরূপ: ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা তাদের পক্ষে কোনো নীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের জন্য রাাজনীতিবিদ ও আমলাদের ঘুষ প্রদান করেন। অথবা প্রথমোক্তরা রাজনীতিবিদ ও তদবিরকারীদের মধ্যস্থতায় নিজেদের আইনী-বেআইনী কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য আমলাদের প্রভাবান্বিত করেন। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থে পদ অথবা ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে আইনী বিষয়কে কৃত্রিমভাবে দুস্প্রাপ্য করে সযোগমত লাভ (scarcity premium) আদায় করা হয় (এর নাম দুর্নীতি)। আমলা মুৎসুদ্দি পুঁজির প্রাধান্যের আমলে উল্লিখিত যোগসূত্র সমগ্র কালো সেক্টরের রক্ষাকবজ হিসেবেই কাজ করে। চতুর্থত অন্যান্য খাতে ঋণ পরিশোধ না করা, অবৈধ জুয়ার আসর বসানো, তহবিল তছরুফ করা ইত্যাদি।

১৯৮৮-৮৯ অর্থবছরে বাংলাদেশে কালো টাকার পরিমাণ ও বিস্তৃতি অনুসন্ধানের একটি প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল[১৯]। অনুরূপ হিসেব পদ্ধতি অনুসরণ করলে দেখা যায় যে ২০০০-২০০১ অর্থবছরে মোট কালো টাকার পরিমাণ প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকা, যা আমাদের জাতীয় আয়ের আনুমানিক এক-তৃতীয়াংশ। সুতরাং বাংলাদেশের সমগ্র অর্থনীতি ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় কালো টাকার মালিক শ্রেণী যে দোর্দণ্ড প্রতাপশালী হিসেবে বিরাজ করছে, এ বিষয়ে দ্বিমতের কোনো অবকাশ থাকা উচিত নয়। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে এই কালো টাকার মালিকেরা যে উৎপাদনশীল বিনিয়োগ করে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তুলতে সক্ষম ও ইচ্ছুক– এমন ভাবনাও অলিক। কালো টাকা সাদা করার ইতিহাস অন্তত তা-ই নির্দেশ করে।

[১৯] বিস্তারিত দেখুন, বারকাত আবুল, 'কালো অর্থনীতি ও কালো অর্থ– উদ্ভবের শর্ত, বিস্তৃতি পরিমাপের অভিজ্ঞতা ও বাংলাদেশে তার পরিমাপ', রাজনীতি- অর্থনীতি জার্ণাল, ১৯৯১ সংখ্যা ১, রাজনীতি গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আমাদের হিসেবানুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, ২০০৩-'০৪ সালে সৃষ্ট উল্লিখিত প্রায় ৭০ হাজার কোটি কালো টাকার ৮৩.৫ শতাংশ সৃষ্টি হয়েছে 'সরকারের রাজস্ব আয় খাতে ফাঁকি (কর ও কর-বহির্ভূত রাজস্ব)' এবং ১৬.৫ শতাংশ 'অবৈধ খাতের কর্মকাণ্ড' (ঘুষ, চোরাচালান ও অন্যান্য) থেকে । সরকারের কর-রাজস্ব ফাঁকির ফলে সৃষ্ট কালো টাকার পরিমাণ ৫৭ হাজার ৪০০ কোটি টাকা, যা মোট কালো টাকার প্রায় ৮২ শতাংশ। 'সরকারের রাজস্ব-আয় খাতে ফাঁকি' উদ্ভূত যে ৫৯ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ কালো টাকা আমরা নির্ণয় করেছি, তার একটি অত্যন্ত গুরুতপূর্ণ নির্দেশক দিক হল এই যে, বাংলাদেশের অর্থনীতি পরনির্ভরশীলতা কমাতে সক্ষম। এই সম্ভাবনা বাস্তবে রূপান্তর করার বিষয়টি রাষ্ট্রব্যবস্থার চরিত্র/বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত।

"মানি লণ্ডারি" কলো অর্থনীতির অন্যতম নির্দেশক। সাধারণত: "মানি লন্ডারিং" বলতে অবৈধ মুদ্রা পাচার বুঝায়। আমার মতে মানি লণ্ডারিং হ'ল অবৈধ পন্থায় আহরিত অর্থ-সম্পদের অবৈধ হস্তান্তর বা রূপান্তর। অর্থনীতিতে লেন-দেন বৈধ অথবা অবৈধ-উভয়ই হয়ে থাকে। বৈধ (দেশের প্রচলিত আইন মতে) লেন-দেন হ'ল প্রধানত: সে-সব খাত সংশ্লিষ্ট যেখান থেকে সরকার কর ও কর-বহির্ভূত রাজস্ব আয় করে থাকেন: আয়কর (ব্যক্তি ও কর্পোরেট-ব্যাংক, বীমা, শিল্প), আমদানী-রপ্তানী শুল্ক, আবগারী শুল্ক, ভ্যাট, বিক্রয়কর, স্ট্যাম্প, ভূমিকর, রেজিস্ট্রেশন, পোস্ট অফিস, টেলিগ্রাম ইত্যাদি। অবৈধ কর্মকাণ্ড (অর্থনৈতিকভাবে আইন-বিরুদ্ধ) উদ্ভূত লেন-দেন-এর অন্যতম হ'ল চোরাচালান, ঘুষ, তহবিল তছরুফ, সন্ত্রাস-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মকাণ্ড। বৈধ খাতের অবৈধ কর্মকাণ্ড (যেমন কর-শুল্ক ফাঁকি) এবং অবৈধ খাতের পুরোটা – উভয়ই অর্থনীতিতে কালো টাকার জন্ম দেয়। আর কালো অর্থ ও সম্পদের সে অংশ (খাতওয়ারি ০% থেকে ১০০% পর্যন্ত হতে পারে) 'মানি লণ্ডারিং'-এর আওতাভুক্ত যা অবৈধ পন্থায় হস্তান্তর বা রূপান্তর হয়। কালো টাকা ও মানি-লণ্ডারিং-এর সঠিক হিসেব নিরূপণ অসম্ভব। কারণ সংশ্লিষ্ট লেন-দেন অনিয়ন্ত্রিত (unregulated), করারোপিত নয় (untaxed), অপরিমাপিত (unmeasured), অ-নথিভুক্ত (working off the books)। তবে আমার হিসেবে 'heuristic' পদ্ধতিতে (সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অবগত এমন অনেকের সাথে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে বেশ কিছু যুক্তি-সংগত অনুমান-এর ভিত্তিতে) পরিমাপিত **২০০২-২০০৩ অর্থবছরে বাংলাদেশে মোট মানি-লণ্ডারিং-এর আনুমানিক পরিমাণ হবে ৩৪,২১৫ কোটি টাকা**। বিভিন্ন খাত-ওয়ারী পরিমাণ নিচের সারণীতে দেখানো হ'ল (বিস্তর বিতর্কের অবকাশ আছে; তবে প্রবণতা মারাত্মক এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই)।

২০০২-২০০৩ অর্থবছরে বাংলদেশে খাত-ওয়ারী মানি লণ্ডারিং-এর পরিমাণ

	খাত	মানি লণ্ডারিং-এর পরিমাণ (কোটি টাকা)
১।	চোরাচালান (আনুমানিক ২০,০০০ কোটি টাকা; ৯০% লণ্ডারিং)	১৮,০০০ (৫২.৬%)
২।	ঘুষ (আনুমানিক ৮,০০০ কোটি টাকা; ৩০% লণ্ডারিং)	২,৪০০ (৭.০%)
৩।	প্রবাসিদের উপার্জিত অর্থ (আনুমানিক ১২,০০০ কোটি টাকা; ৪০% অবৈধ শ্রমিক; ৬০% লণ্ডারিং)	৭,২০০ (২১.০%)
৪।	আমদানী-রপ্তানী শুল্ক ফাঁকি (ওভার ও আন্ডার ইনভয়েস) (আনুমানিক ৩,৫০০ কোটি টাকা; ৩৩% লণ্ডারিং)	১,১৫৫ (৩.৪%)
৫।	কর ফাঁকি (ব্যক্তি; কর্পোরেট; ভ্যাট ও আবগারী শুল্ক; অন্যান্য) (আনুমানিক ১৮,০০০ কোটি টাকা (৩,০০০+৬,০০০+৮,০০০+১,০০০); ২৫% লণ্ডারিং)	৪,৫০০ (১৩.২%)
৬।	চিকিৎসা ব্যয় (আনুমানিক ১,২০০ কোটি টাকা; ৮০% লণ্ডারিং)	৯৬০ (২.৮%)
৭।	বিদেশে শিক্ষা ব্যয় (১,২,৩,৪,৫ উৎসে অন্তর্ভুক্ত)	-
৮।	বিলাস ভ্রমণ (১,২,৩,৪,৫ উৎসে অন্তর্ভুক্ত)	-
	মোট	৩৪,২১৫ (১০০%)

আমাদের হিসেবে ২০০৩-০৪ অর্থবছরে বাংলাদেশে বিভিন্ন উৎস ভিত্তিক কালো টাকার আনুমানিক পরিমাণ হবে নিম্নরূপ (পরিমাণের ক্রমানুসারে): আবগারি শুল্ক ফাঁকি ২৬ হাজার ৬৭০ কোটি টাকা; ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাংক, শিল্প ও ইন্সুরেন্সের আয় ও অন্যান্য ফাঁকি ১৫ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা অনেকে সংজ্ঞাভেদে ১০ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত বলেন; চোরাচালান ৭ হাজার ৭০০ কোটি টাকা (অনেকে ১০-২০ হাজার কোটি টাকাও বলেন); আয়কর ফাঁকি ৬ হাজার ৬৫০ কোটি টাকা; আমদানি-রপ্তানি শুল্ক ফাঁকি ৫ হাজার ৩২০ কোটি টাকা; ঘুষ ২ হাজার ৫১০ কোটি টাকা (অনেকে সংজ্ঞাভেদে ১০ হাজার কোটি টাকাও বলেন); অন্যান্য (বৈধ ও অবৈধ– উভয় ধরণের কর্মকাণ্ডে), যার মধ্যে আছে বিক্রয় কর ফাঁকি, কর বহির্ভূত রাজস্ব ফাঁকি, ষ্ট্যাম্প, ভূমিকর-ফাঁকি, রেজিষ্ট্রেশন ফিস ফাঁকি, ডাক ও তার মাশুল ফাঁকি, ভেজাল-নকল দ্রব্য উৎপাদন, মজুতদারী, কালোবাজারী, অরেজিষ্ট্রিকৃত প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি ইত্যাদি ৫ হাজার ৪৬০ কোটি টাকা।

গত তিন দশকে আমদের দেশে কালো টাকার উৎপত্তির শর্তসমূহ এমনভাবে পরিপুষ্ট হয়েছে যে, সেসব শর্ত বিলুপ্ত না হলে কালো টাকার পরিমাণ ও তার সামগ্রিক প্রভাব ও অভিঘাত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কালো টাকা যখন একই সঙ্গেঅর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের কারণ ও পরিণাম এবং তা যখন ক্রমবর্ধিষ্ণু সর্বশক্তিমান খাত, তখন বিষয়টি যথামাত্রায় দুশ্চিন্তার উদ্রেগ করবে, এটাই স্বাভাবিক।

সরকারি ব্যয় বরাদ্দ: মানব উন্নয়ন লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্য ছিল মাত্র

স্বাধীন বাংলাদেশে 'মানব উন্নয়ন দর্শনই' হওয়া উচিত ছিল অর্থনৈতিক উন্নয়নের কেন্দ্রিয় দর্শন, যে দর্শনে মানব উন্নয়ন হল স্বাধীনতা-মধ্যস্থতাকারী একটি প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ায় মানুষের জন্য পাঁচ ধরণের স্বাধীনতা নিশ্চিত হতেই হবে– অর্থনৈতিক সুযোগ (economic opportunities), সামাজিক সুবিধাদি (social facilities), রাজনৈতিক স্বাধীনতা (political freedom), স্বচ্ছতার গ্যারান্টি (transparency guarantee), এবং সুরক্ষার নিশ্চয়তা (protective security)।

প্রকৃত অর্থে মানব উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়নে সরকারের প্রতিশ্রুতির মাত্রা কতটুক, তা বিচারের জন্য স্বাধীনতাত্তোর তিন দশকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের[২০] মত মানব উন্নয়ন নির্দেশক খাত সমূহের পাশাপাশি অনুৎপাদনশীল প্রতিরক্ষা, প্রশাসন, নিরাপত্তা খাতসমূহের রাজস্ব ব্যয় বরাদ্দের বিশ্লেষণ জরুরি[২১]। উন্নয়নের মূল ধারায় `inclusion of the excluded' ব্যাপারটিকে কে কিভাবে দেখেছে, এ বিশ্লেষণ তারও ইঙ্গিত দেয়।

প্রতিরক্ষা খাতে সরকারের প্রকৃত ব্যয় কত, পাকিস্তান আমল থেকেই তো রাষ্ট্রীয় 'টপ সিক্রেট' হিসেবে গোপন রাখা হয়েছে। অতএব এ-বিষয়টা নানাবিধ হিসেব-নিকেশের জন্ম দিয়ে চলেছে যা উপাত্ত-ভিত্তিক নয় এবং যথেষ্ট মাত্রায় আনুমানিক। প্রতিরক্ষা খাতের ঘোষিত ব্যয় এই খাতের মোট ব্যয়ের খণ্ডিত অংশ– এটুকু সহজেই বোঝা যায়। অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, সশস্ত্র বাহিনীসমূহের (স্থল, বিমান, নৌ) ব্যবহৃত সাজ-সরঞ্জাম

[২০] নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ থিওডর সুলজ, গ্যারি বেকার ও অমর্ত্য সেনের মতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। তাদের মতে শিক্ষা- অর্থনৈতিক উন্নয়নের জ্ঞান-ভিত্তি সৃষ্টি করে; শিক্ষা মানব পুঁজি গঠনের কেন্দ্র-ভিত্তি; শিক্ষা মানব সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যম। স্বাস্থ্য মানব পুঁজির অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু; স্বাস্থ্য ব্যক্তির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে, ব্যক্তির সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনকে সমৃদ্ধ করে। জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল কফি আনান কর্তৃক বিশ্বব্যাপি জরিপে সারাবিশ্বের পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে সকলে 'সুস্বাস্থ্য'-কে প্রধান চাহিদা হিসেবে প্রকাশ করেছে (Millennium Poll, UN 2000)। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার Commision on Macroeconomics and Health স্বাস্থ্য সংক্রান্ত চিরাচরিত ধারণা 'অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হলে মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত হবে'-টি চ্যালেঞ্জ করে উল্টোটা বলছে যে, 'দরিদ্র দেশে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের অপরিহার্য পূর্বশর্ত'। এসব বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, Schultz T.P. 1981. Economics of Population, N. Y.; Becker.G.S. 1981. A Treatise on Family, Harvard University Press; Sen. A. K. Development as Freedom, N.Y.; WHO. 2001. Macroeconomics and Health : Investing in Health for Economic Development (Jeffrey D. Sachs, Chairman, Commission of Macroeconomics and Health).

[২১] এই অনুচ্ছেদের তথ্য অধ্যাপক মইনুল ইসলাম ও আবুল বারকাত রচিত 'বাংলাদেশের বাজেটে অনুৎপাদনশীল খাতসমূহের রাজস্ব ব্যয় বনাম মানব *উন্নয়ন' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া। প্রবন্ধটি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত (২ জুন ২০০১)-এর গোলটেবিলে ধারণাপত্র হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছিল।*

কিংবা বাহিনীসমুহের স্থাপনাসমূহের পিছনে সরকারি ব্যয় সম্পর্কে সঠিক হিসেব পাওয়া অসম্ভব। এমনকি সরকারি বাজেটের শিক্ষা খাত, স্বাস্থ্য খাত, গণপূর্ত খাত, খাদ্য বাজেট, ঋণ পরিশোধ খাত, 'অন্যান্য' ইত্যকার নানান খাতে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের সঙ্গে সম্পৃক্ত কার্যক্রমের সরকারি ব্যয়। প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত বৈদেশিক ঋণ এবং অনুদানের তথ্যও 'টপ-সিক্রেট'। তবে সাধারণভাবে বলা চলে, ১৯৭২ সালকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করলে ২০০১ সালে এসে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের আয়তন ন্যূনপক্ষে দশগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে ক্যান্টনমেন্টের সংখ্যা এবং আয়তন বৃদ্ধি থেকেও তা সহজে বোঝা যায়।

উপযুক্ত তথ্যহীনতার মধ্যেও বিভিন্ন উৎসের ভিত্তিতে একথা বলা সম্ভব যে, আমাদের দেশে প্রতিরক্ষা ব্যয় দ্রুত লয়ে বৃদ্ধি পেয়ে দারিদ্র দূরীকরণ ও সামাজিক কল্যাণ খাতের কাঙ্ক্ষিত গতি রুদ্ধ করেছে। এ বিষয়ে ইউএনডিপি-সহ দক্ষিণ এশিয় মানব উন্নয়ন রিপোর্টে প্রদত্ত কিছু তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে–

- ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৬ সালে প্রতিরক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৫২ শতাংশ (US$ ৩৪১ মিলিয়ন থেকে ৫১৭ মিলিয়নে)– যেখানে একই সময়ে ন্যাটোর প্রতিরক্ষা ব্যয় হ্রাস পেয়েছে ২৫ শতাংশ,
- ১৯৮৫-১৯৯৬ কালপর্বে প্রতিরক্ষা ব্যয়ের বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল ৩.৭ শতাংশ (যে হার পাকিস্তান, ভারত ও শ্রীলঙ্কার হারের চেয়ে বেশি),
- ১৯৮৫ সালের তুলনায় ১৯৯৬ সালে স্থাপনার সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ,
- প্রতি ১ হাজার ডাক্তারের বিপরীতে ৬ হাজার সেনা সদস্য,
- প্রতি এক হাজার শিক্ষকের বিপরীতে ৩০০ সেনা সদস্য, এবং
- ১৯৭২ থেকে অদ্যাবধি রাজস্ব বাজেট থেকে প্রতিরক্ষা খাতে যে ব্যয় 'দেখানো' হয়েছে, তা শিক্ষা ও ক্রীড়া খাতের চেয়ে বেশি এবং স্বাস্থ্য (জনসংখ্যাসহ) খাতের চেয়ে কমপক্ষে তিনগুণ বেশি।

আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত এমন কোনো সরকার আসেনি যে সরকার উচ্চস্বরে দাবি করেনি যে 'এবার আমরা শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছি'। অথচ এটা প্রতারণাপূর্ণ ভাষ্য। ১৯৭২ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ গত ৩০ বছরে মোট রাজস্ব ব্যয় হয়েছে এক লাখ ৫৭ হাজার ৯৩ কোটি টাকা যেখানে শীর্ষ স্থানে আছে সাধারণ প্রশাসন (১৯.৯%), দ্বিতীয় শীর্ষস্থানে প্রতিরক্ষা (১৭.৬৪%), তৃতীয় স্থানে শিক্ষা ও ক্রীড়া (১৭.৪৮%, শুধু শিক্ষা নয় ক্রীড়াসহ শিক্ষা যেখানে শিক্ষা বাজেট জনগণের শিক্ষার লক্ষ্যে ছিল কিনা তা বিশেষ বিশ্লেষণের দাবি রাখে), চতুর্থ স্থানে ঋণ পরিশোধ (১২.৬৩%, যে ঋণের ৭৫% জনগণের কাছে পৌঁছেনি), পঞ্চম স্থানে পুলিশ ও বিচার (৮.২১%), এবং ষষ্ঠ স্থানে অন্যান্য (৫.৮১%, যার ব্যাপকাংশ কোনো অর্থেই মানব উন্নয়নমুখী নয়)। এমন হওয়াটাই স্বাভাবিক যে, রাজস্ব বাজেটে আসলে প্রতিরক্ষার অবস্থান দ্বিতীয় শীর্ষ নয়, শীর্ষস্থানেই। শিক্ষা বাজেটে প্রতিরক্ষা-সংশ্লিষ্ট শিক্ষার অংশ, ক্রীড়া বাজেটে প্রতিরক্ষা-সংশ্লিষ্ট ক্রীড়ার অংশ, স্বাস্থ্য বাজেটে প্রতিরক্ষায় নিযুক্তদের অংশ, ঋণ পরিশোধের সঙ্গে প্রতিরক্ষা-সংশ্লিষ্টতার অংশ– এসব কোনোভাবে আলাদা করে দৃশ্যমান প্রতিরক্ষার সঙ্গে যুক্ত করলে তা ১৭.৬৪ শতাংশ থেকে কমপক্ষে ৩০ শতাংশে উন্নিত হতে পারে। আর সেক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা খাতটিই হবে রাজস্ব বাজেটের প্রকৃত সর্বশীর্ষ খাত।

গত তিন দশকে মোট রাজস্ব বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতের দৃশ্যমান অংশ ছিল ১৭.৬৪ শতাংশ। দৃশ্যমান এই হারটি প্রত্যেক আমলে আগের আমলের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে: ১৯৭২/৭৩-১৯৭৫/৭৬-এ (বঙ্গবন্ধুর চার বছর) ১৪.০২ শতাংশ, ১৯৭৬/৭৭-১৯৯০/৯১ (জিয়া ও এরশাদের সামরিক শাসনের ১৫ বছর)-এ ১৬.৯৫ শতাংশ,

১৯৯১/৯২-১৯৯৫/৯৬ (খালেদা জিয়ার ৫ বছর)-এ ১৭.৮৪ শতাংশ, ও ১৯৯৬/৯৭-১৯৯৯/০০ (শেখ হাসিনার ৫ বছর)-এ ১৮.১ শতাংশ। ২০০২-২০০৩ অর্থবছরের বাজেটেও এ ধারা বহাল আছে। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান মানববঞ্চনার যে চিত্রটি আমরা ইতোমধ্যে তুলে ধরেছি, তো সঠিক হলে জনগণের অপার শক্তির প্রতি অবিশ্বাস এবং/অথবা জনগণের মধ্যে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শাসকশ্রেণীর ভিত্তি দূর্বল না হলে এবং/অথবা দুর্বৃত্তদের শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি না পেলে বাজেটে প্রতিরক্ষার দৃশ্যমান অংশ এভাবে ক্রমাগত বৃদ্ধির কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

১৯৭২/৭৩ অর্থ বছরের বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতের ব্যয় বরাদ্দ ছিল মোট ব্যয় বরাদ্দের মাত্র ৯.৪৮ শতাংশ। ১৯৭৪-৭৫ সালের বাজেট পর্যন্ত তা মোট রাজস্ব ব্যয়ের ১১.৩ শতাংশে সীমাবদ্ধ ছিল। অথচ ঐ বছরগুলোতেই পাকিস্তান-প্রত্যাগত সামরিক কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীসমূহে আত্মীকৃত করা হয়েছিল। ১৯৭৫/৭৬ অর্থ বছরে প্রতিরক্ষাখাতের ব্যয় বরাদ্দ এক লাফে ১৯.৬ শতাংশে পৌঁছে যাওয়াটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। রক্ষী বাহিনীকে স্থল বাহিনীর সঙ্গে একীভূত করায় প্রতিরক্ষা ব্যয় বেড়েছিল নিঃসন্দেহে, কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের রাষ্ট্রক্ষমতা পরিবর্তনের ঘটনা এবং তদপরবর্তী ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমে সমর-প্রভুদের ক্ষমতা দখল ঐ ব্যয় বরাদ্দ উল্লম্ফনের পেছনে প্রধান নির্ধারক ভূমিকা পালন করেছিল বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না। প্রতিরক্ষা ব্যয়ের প্রকাশ্য হিস্যা এক বছরে ১১.৩০ শতাংশ থেকে ১৯.০৬ শতাংশে বেড়ে যাওয়া সরকারি বাজেট প্রক্রিয়ায় সত্যিকার অর্থেই একটা নাটকীয় পরিবর্তন, যা বাংলাদেশের রাষ্ট্রযন্ত্রের চরিত্র পরিবর্তনের একটা বিশেষ সাক্ষী হিসাবে বিবেচিত হওয়া উচিত। পরবর্তী বছরেই ঐ ব্যয় বরাদ্দ আরও বেড়ে ২২.২৭ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু, আরেকটি উল্লম্ফনও দৃষ্টিকটুভাবে ধরা পড়েছে। ১৯৮৩/৮৪ সালে, স্বৈরাচারী এরশাদ কর্তৃক সশস্ত্র বাহিনীসমূহকে বশে রাখার তাগিদে ১৯৮৩ সালের প্রবর্তিত নতুন বেতন-ভাতা কাঠামোতে সশস্ত্র বাহিনীসমূহকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছিল। বলা বাহুল্য, ১৯৮৩/৮৪ অর্থ বছরের ২২.৭ শতাংশ বাজস্ব ব্যয় বরাদ্দ 'প্রকাশ্যে' প্রতিরক্ষা বরাদ্দের মধ্যে সর্বোচ্চ রয়ে গেছে আজ অব্দি। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সিভিলিয়ান সরকারের মেয়াদ পূর্তির এগারো বছর পেরিয়ে এসেও প্রতিরক্ষা খাতে সরকারি ব্যয়ের সংকোচন সম্ভব হয়নি। সামরিক অভ্যুত্থানে ক্ষমতা হারানোর ভীতি হয়তো বা নির্বাচিত সরকারগুলোকে আতংকিত করে চলেছে। আমাদের প্রশ্ন হল, সরকার যদি জনগণ কর্তৃক জনগণের স্বার্থেই নির্বাচিত হয়ে থাকেন, তাহলে সামরিক অভ্যুত্থান ভীতি কেন?

প্রতিরক্ষা খাতে 'দৃশ্যমান' রাজস্ব ব্যয়ের পাশাপাশি যে বিপুল পরিমাণে অদৃশ্য উন্নয়ন বাজেট ব্যয় হয়ে থাকে, তার প্রকৃত পরিমাণ 'টপ সিক্রেট'। এমনকি সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটির মাধ্যমেও সে বিষয়ে কোনো কিছুই জনগণকে জানানো হয় না। বিষয়টি যাই হোক না কেন, এ বিষয়ে দ্বিধার অবকাশ নেই যে, যুদ্ধাস্ত্র ক্রয়ে আমরা যে ব্যয় বরাদ্দ করছি তার সঙ্গে মানব উন্নয়ন ও মানব নিরাপত্তার সম্পর্ক বিপরীতমুখী। এসব কেনাকাটার সঙ্গে জাতীয় অগ্রাধিকার কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়, সম্ভবত প্রধান বিবেচ্য বিষয় হল গুটিকয়েক ক্ষমতাধর ব্যক্তির 'ক্রেতা কমিশন'। প্রকৃত অর্থে মানব বঞ্চনার বিস্তৃত কাঠামোর মধ্যে যুদ্ধাস্ত্র ক্রয়ের বিষয়টি সাধারণ কোনও ভ্রান্তি নয়– তা সম্ভবত গভীর উদ্দেশ্য প্রণোদিত, জনগণের স্বার্থ বিরোধী ও সমাজে বিদ্যমান ব্যাপক অসাম্য জিইয়ে রাখা এবং 'দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদ' লালনের অন্যতম কৌশল মাত্র।

যৌথভাবে সাধারণ প্রশাসন ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা খাতে স্বাধীন বাংলাদেশের সব সরকারের রাজস্ব ব্যয়ের তুলনামূলক বিচারে সর্বনিম্ন হিস্যা ছিল ২৩.২১ শতাংশ, ১৯৭৪/৭৫ অর্থ বছরে। ১৯৮৪/৮৫ অর্থ বছরে ঐ ব্যয়ের হিস্যা সর্বোচ্চ ৪১.২০ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছিল। পুরো আশির দশকেই প্রশাসন ও নিরাপত্তা খাতে সরকারি রাজস্ব ব্যয় সাধারণভাবে বেশি ছিল। নব্বইয়ের দশকে এই দু'টো খাতে রাজস্ব ব্যয় ধীরগতিতে কমার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে, এবং ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে তা ২৭.৭৬ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। যুগোপযোগী প্রশাসনিক সংস্কার এবং আধুনিক প্রযুক্তির (বিশেষত তথ্য প্রযুক্তির) সহায়তায় এ-দু'টো খাতে সরকারি ব্যয় ক্রমান্বয়ে ২০ শতাংশে নামিয়ে আনা সম্ভব।

মানব উন্নয়ন দ্রুত করার লক্ষ্যে স্বাধীনতার তিনটি রূপ (রাজনৈতিক স্বাধীনতা, স্বচ্ছতার গ্যারান্টি ও সুরক্ষার নিশ্চিয়তা) নিশ্চিত করতে হবে। এ ব্যাপারে সাধারণ প্রশাসনসহ অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা খাত সমূহের ভূমিকা থাকার কথা। এখানে সাধারণ প্রশাসন, পুলিশ ও বিচার বিভাগসহ অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংক্রান্ত সরকারি ব্যয়ের খাতসমূহের বিস্তৃতি ও দক্ষতা-নির্দেশক সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে:

- গত তিন দশকের মধ্যে ২৭ বছরই সাধারণ প্রশাসন খাতটি ছিল রাজস্ব ব্যয়ের প্রধান খাত,
- ১৯৭৫ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে আমলাতন্ত্রের আয়তন দ্বিগুণ হয়েছে,
- স্বাধীনতার পরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গড় হার ২ শতাংশ অথচ সাধারণ প্রশাসনের বার্ষিক গড় বৃদ্ধির হার ৩.৫ শতাংশ (বর্তমানে ৩৯টি মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ বিভাগসমূহে প্রায় ১২ লাখ চাকুরে),
- সরকারি ব্যয়ের প্রায় অর্ধেকই ব্যয় হয় প্রশাসনের বেতন-ভাতা হিসাবে।

গত তিন দশকে বাংলাদেশে শাসক দলের রাজনীতিকবৃন্দ, সামরিক আমলাতন্ত্র, সিভিল আমলাতন্ত্র এবং বিকাশমান মুৎসুদ্দী পুঁজির যে 'গ্রান্ড এলায়েন্স' কর্তৃক রাষ্ট্র ক্ষমতা অপপ্রয়োগের মাধ্যমে দুর্নীতির সিস্টেম ও কাঠামো গড়ে উঠেছে, তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধা হিসেবে ইতোমধ্যেই চিহ্নিত করা হয়েছে উন্নয়নে সুশাসন বা 'governance' [২২] ইস্যুকে কেন্দ্রিয় গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রযন্ত্রকে পুঁজি লুণ্ঠনের কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে সফলভাবে অপপ্রয়োগের এই ব্যবস্থাটি বর্তমানে সর্বগ্রাসী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ধারণ করেছে বলা চলে। অতএব, যত্রতত্র আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা বিস্তারকে প্রতিরোধ করতে হবে শুধু সরকারি রাজস্ব ব্যয়হ্রাসের লক্ষ্যে নয়, দুর্নীতি, দীর্ঘসূত্রতা, অপ্রয়োজনীয় পদ্ধতিগত জটিলতা এবং তথাকথিত 'সিস্টেম লস' নিরসনের উদ্দেশ্যে। আমলারা প্রকৃত অর্থে পাবলিক সার্ভেন্ট (জন সেবক) নয়, বরঞ্চ পাবলিকই আমলাদের সার্ভেন্ট। সরকারি রাজস্ব ব্যয়ের বহুগুণ বেশি জাতীয় আয় ও সম্পদ বর্তমানে আমলাতন্ত্রের মধ্যস্থতায় দুর্নীতির কালো পথে পাচার করে দিচ্ছে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের এজেন্টরা— বিদেশি দাতা চক্র, এদেশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, ঋণখেলাপি চক্র, এবং এদের সকলের লালিত চাঁদাবাজ মাস্তানরা। এই আত্মঘাতী লুণ্ঠন প্রক্রিয়াকে বন্ধ করতে হলে অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তাভাবনার যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি রাষ্ট্রের ওপর জনগণের মালিকানা কিভাবে কার্যকরভাবে বাড়ানো যাবে, সে সম্পর্কেও জাতীয় পর্যায়ে আলোচনা, বিশ্লেষণ ও পদক্ষেপ গ্রহণের আবশ্যকতা রয়েছে। উল্লিখিত ত্রি-মাত্রিক সুশাসন প্রতিষ্ঠার এটাই হ'ল প্রথম ও প্রধান পূর্বশর্ত।

বাজেট উপস্থাপনের সময় গৎবাঁধা বুলি হিসেবে যদিও শিক্ষা খাতকে সরকারি ব্যয় বরাদ্দে সর্বোচ্চ আসনটি প্রদানের ঘোষণা উচ্চারিত হয়ে চলেছে, তবু সত্য হলো, একদিকে যেমন শিক্ষা খাতে প্রকৃত ব্যয় বরাদ্দ অপ্রতুল, অন্যদিকে শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে দুর্নীতি, বৈষম্য ও সন্ত্রাসের লালনক্ষেত্রে পর্যবসিত হয়েছে। মানব উন্নয়নের মূল চাবিকাঠির ধারক শিক্ষা খাতকে অব্যবস্থা ও দুর্নীতির শিকার করে রাখার দায়ভার স্বাধীনতা-উত্তর প্রতিটি সরকারের ওপরই কমবেশি বর্তাবে। তবু বলতে হবে, ১৯৭২/৭৩ অর্থ বছরের বাজেটে রাজস্ব ব্যয়ের ২১.১৬ শতাংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করে বঙ্গবন্ধুর সরকার এ ব্যাপারে যে অঙ্গিকার ব্যক্ত করেছিলেন, পরে কোনো সরকারই সে অঙ্গীকার বাস্তবায়নে নিষ্ঠাবান হননি। বরং রাজস্ব বাজেটে ব্যয় বরাদ্দে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানের ব্যাপারটি একটি প্রতারণাপূর্ণ সংখ্যা তত্ত্বের মারপ্যাচ (number game)-এ পর্যবসিত হয়েছে। ১৯৭৫/৭৬ অর্থ বছর থেকে ১৯৯৯/২০০০ অর্থ বছর পর্যন্ত ২৫ বছরের মধ্যে ১৬ বছরই প্রতিরক্ষা খাতে প্রকৃত সরকারি ব্যয় শিক্ষা ও ক্রীড়া খাতের চাইতে বেশি ছিল। ১৯৮৩/৮৪ অর্থ বছরে শিক্ষা ও ক্রীড়া খাতের ব্যয় ছিল সরকারি রাজস্ব ব্যয়ের মাত্র ৮.৬৯ শতাংশ, অথচ ঐ একই বছর প্রতিরক্ষা খাতে সর্বোচ্চ

[২২] সুশাসন বা 'good governance' প্রত্যয়টিকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়ে থাকে। আমার মতে সুশাসন হ'ল অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত 'মানবিক শাসনের' (humane governance) তিনটি দিকের সমাহার: অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক (civic অর্থে)। অর্থনৈতিক সুশাসনের মূল উপাদান হ'ল জাতীয় সম্পদের প্রতি জনগণের সম অভিগম্যতা নিশ্চিত করা, মানব উন্নয়ন ও দারিদ্র দূরীকরণ প্রক্রিয়াকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান, অর্থনৈতিক সমতা-ভিত্তিক বণ্টন নিশ্চিত করা ইত্যাদি। রাজনৈতিক সুশাসনের মূল প্রতিপাদ্য শাসক-প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা আর আইনের প্রতি শ্রদ্ধা নিশ্চিত করা। আর সিভিক সুশাসনের মূল প্রতিপাদ্য হওয়া উচিত শাসন-ব্যবস্থার সকল স্তরে জনগণের প্রকৃত অংশগ্রহণ (টোকেনইজম নয়) নিশ্চিত করা।

২২.৭০ শতাংশ রাজস্ব ব্যয় রেকর্ড করা হয়েছিল। রাজনৈতিক বক্তৃতামালা এবং কাজের মধ্যে ফারাক আরও বেশি প্রণিধানযোগ্য এ কারণে যে, দেশের সাক্ষরতার হার বৃদ্ধিতে সরকার বিরাট সাফল্য দাবি করছে। ৬৫ শতাংশ সাক্ষরতা অর্জনের দাবি 'বীরবলের কাক গণনার' মতই হয়ে দাঁড়াবে ওয়াকিবহাল মহলের কাছে। শিক্ষা খাতে তথাকথিত এই সাফল্যের দাবি মানব উন্নয়নের মত জাতির জীবন-মরণ ইস্যুতে জনগণের সঙ্গে প্রতারণার শামিল। শিক্ষা নিয়ে প্রতারণা যে চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে তা সহজবোধ্য এ কারণেই যে, শতকরা ১০০ ভাগ সাক্ষরতা অর্জন করেও শতকরা ৮০ ভাগ মানুষকে কার্যত নিরক্ষর রাখা সম্ভব। অন্যদিকে সরকার মুক্তবাজার অর্থনীতির আফিম গলাধঃকরণ করে শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করার হুজুগে মেতে উঠেছে, এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষম্যকে ঘোষিত শিক্ষা নীতির মাধ্যমে সমাজ জীবনে দৃঢ়মূল করার ব্যবস্থাকে জোরদার করেছে। দক্ষিণ এশিয়ায় জিডিপি'র শতাংশ হিসাবে শিক্ষা খাতে ব্যয়ে বাংলাদেশ সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করছে। UNESCO যেখানে জিডিপি'র ৮ শতাংশ শিক্ষার জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে অঙ্গীকারাবদ্ধ করছে, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ অন্যতম স্বাক্ষরকারী সদস্য দেশ হয়ে জিডিপি'র মাত্র ২.৩ শতাংশ শিক্ষা খাতে সরকারিভাবে ব্যয় করে সাফল্যের বড়াই করাটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও মিথ্যাভাষ্য মাত্র। বাংলাদেশে স্বাক্ষরতা অভিযান যে ভাবে চলছে তাতে করে আনুষ্ঠানিকভাবে ১০০ ভাগ সাক্ষরতা অর্জিত হলেও ৮০ ভাগ কার্যত নিরক্ষর থেকেই যাবে। যে কারণে Total Literacy Movement (TLM) নামে যে কর্মসূচি চালু আছে, তাকে total loss of money (পুরো অর্থ পানিতে ফেলা) অথবা total lie movement (সম্পূর্ণ মিথ্যা আন্দোলন) হিসেবে অভিহিত করলে অত্যুক্তি হবে না।

সুস্থ ও শিক্ষিত মানব ভিত্তি ছাড়া প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়— এ কথা সবাই স্বীকার করেন। এ দিক থেকে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতটি মানব উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য একটি প্রধান খাত। মানুষের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্বও বটে। অথচ এ খাতটিকে উত্তরোত্তর অধিকহারে বাজারের হাতে সোপর্দ করার কাজটি যথেষ্ট মাত্রায় এগিয়ে গেছে। মানব-বঞ্চনা নির্দেশক স্বাস্থ্য খাতের বেহাল অবস্থা ইতোমধ্যে আমরা কয়েকদফা উল্লেখ করেছি। এ খাতটিতে বরাদ্দ অবস্থাকে 'বেশিরভাগের ভাগে কম' (too little for too many) হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। সরকারই বলছেন, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা খাতে মাথাপিছু ১২ ডলার ব্যয় হওয়া উচিত, অথচ ব্যয় হচ্ছে মাথাপিছু মাত্র ৪ ডলার। মোট বাজেটের কোনো বৃদ্ধি ছাড়াই খাতওয়ারী বরাদ্দের অগ্রাধিকার বিন্যাস মানব-মুখী করলেই যে মাথাপিছু স্বাস্থ্য ব্যয় ১২ ডলারে উন্নিত করা যায়, তা সাধারণ পাটিগাণিতিক হিসেব।

বাস্তবতা হ'ল ঐ সাধারণ বোধ্য পাটিগাণিতিক হিসেবে দেশ চলছে না। মূল কথা হল, চৌদ্দ কোটি মানুষের বাংলাদেশে প্রায় সাত কোটিই দরিদ্র। আর এদের অধিকাংশই প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ বঞ্চিত। ইদানিং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (Diseases of Poverty) দারিদ্রের রোগ-র আওতায় ৭-টি রোগের কথা বলছে। যার অন্তর্ভূক্ত হল যক্ষা, ম্যালেরিয়া, প্রজননতন্ত্রের (যৌনবাহিত) রোগ, জন্মদান প্রক্রিয়ায় মা ও শিশুদের রোগ, শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমন (নিউমোনিয়া), ডায়রিয়া ও হাম। আমদের দেশে এই সাতটি রোগের বোঝা মূলত দরিদ্রদের উপরই পড়ে। যে ৭০ ভাগ শিশু ও যুবক (young adult অর্থে) ঐ সব রোগে মৃত্যুবরণ করে, তাদের প্রায় সকলেই দরিদ্র শ্রেণীভূক্ত; 'দারিদ্রের রোগে' মৃত্যু অথবা পঙ্গুত্বের কারণে দারিদ্রের দুষ্ট চক্রটি চলতেই থাকে; 'দারিদ্রের রোগ' এ মুহূর্তে দূর করতে না পারলে ভবিষ্যতে সরকার ও দরিদ্র পরিবার উভয়কেই স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে বাধ্য হতে হবে। আসলে শাসকগোষ্ঠি এ বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা করেন না, কারণ যাদের জন্য নিজেদের বর্তমানই একমাত্র কাল, তারা সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যৎ কাল নিয়ে মানব কল্যাণের চিন্তা করবেন— এটা দূরাশা।

দেশের সাধারণ মানুষের সুস্বাস্থ্য বিষয়টি নিঃসন্দেহে দারিদ্র দূরীকরণের অন্যতম প্রধান কৌশল হতে পারে। 'দারিদ্রের রোগ' বিষয়টি জাতীয় নীতি-কৌশল হিসাবে গ্রহণ করলে সম্ভবত চারভাবে দারিদ্র দূর হতে পারে:

এক. আয়ের দিক থেকে দরিদ্রদের পরিভোগে যে আকস্মিক আঘাত আসে– যার ফলে শিশু ও মহিলাদের পুষ্টি মাত্রা নিম্নগামী হয়– তা প্রতিহত হবে।

দুই. অসুস্থতাজনিত উৎপাদনশীলতা হ্রাস প্রতিহত হবে।

তিন. আয়-দরিদ্রদের সক্ষমতা সরাসরি বৃদ্ধি পাবে।

চার. অর্থনৈতিক ও অর্থনীতি-বহির্ভূত লাভ বৃদ্ধি পাবে।

আসলে স্বাস্থ্যখাতে 'দারিদ্রের রোগ' সম্পর্কে এসবই হল আমাদের আকাঙ্খার কথা। বাস্তবতা ভিন্ন। এ খাতে সরকারি ব্যয় লজ্জাজনকভাবে অপ্রতুল, যা সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলোর বেহাল দশা দেখে বোঝা যায়। ১৯৯২/৯৩ সালে ৭.৪২ শতাংশ রাজস্ব ব্যয় এ খাতে সর্বোচ্চ হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছিল, যা এখন আবার ৫.৭ শতাংশে নেমে গেছে। সমাজের বিত্তশালী এবং মধ্যবিত্তরা সুচিকিৎসার আশায় বিদেশে ছুটছেন কিংবা ব্যয়বহুল প্রাইভেট ক্লিনিকের আশ্রয় নিচ্ছেন, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্নীতি, অব্যবস্থা, অবহেলা এবং অসদাচারণের প্রতীক হয়ে বহাল রয়েছে। মুক্ত বাজার অর্থনীতির দর্শন চিকিৎসাকেও একটি লোভনীয় 'পণ্যে' পরিণত করেছে, যা বাংলাদেশের দরিদ্র জনগণের জন্য মারনাঘাতের শামিল। দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্যও দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদে পড়েছে।

এক কথায় সরকারি ব্যয়-বরাদ্দের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গত তিন দশকে উক্ত ব্যয় বরাদ্দে মানব উন্নয়ন বিষয়টি কখনও কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় গুরুত্ব পায়নি। রাজস্ব ব্যয়ের সিংহভাগই অনুৎপাদনশীল খাত চিরস্থায়ীকরণে ব্যবহৃত হয়েছে, আর মানব উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট খাতের বরাদ্দ প্রকৃত অর্থে মানব উন্নয়নের লক্ষ্যে হয়েছে কি না, সে কথাও প্রশ্ন সাপেক্ষ। বরাদ্দ কাঠামো বিশ্লেষণে 'সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্য স্বল্প বরাদ্দ, আর সংখ্যালঘিষ্টের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ'– এরকমটি পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং প্রকৃত মানব উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে সরকারি ব্যয় বরাদ্দে কাঠামোগত রূপান্তর প্রয়োজন। প্রশ্নটি স্পষ্টতই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক।

রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যালান্স-শিট

আমরা নিশ্চিত যে, গত তিন দশকে এদেশে আর্থ-সামাজিক মূল প্রবণতা হ'ল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন। দুর্বৃত্তায়িত হয়েছে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান : ১০ লাখ দুর্বৃত্ত ১৩ কোটি ৯০ লাখ সাধারণ মানুষকে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বৃত্তায়নের কাঠামোর মধ্যে জিম্মি করে রেখেছে। ক্ষমতাধর সংখ্যালঘিষ্ঠ দুর্বৃত্ত ও দুর্বৃত্তায়নের শিকার ক্ষমতাহীন সংখ্যাগুরু– এ দু'টি ধারা স্পষ্টতই বিরাজ করছে। গত তিন দশকে বিকশিত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যালান্স শিট (সারণীতে দেখানো হয়েছে) যে চিত্র দেখায়, তাতে স্পষ্ট যে, যা কিছু মানবকল্যাণবিমুখ ও উন্নয়ন বিরোধী সেগুলো শনৈঃ শনৈঃ প্রবৃদ্ধি লাভ করেছে; মনুষ্য সম্পর্কসহ সবকিছুই বাজারি পণ্যে রূপান্তরিত হয়েছে; প্রান্তস্থ আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ নেতৃত্বের অভাবে উৎপাদনশীল ও জনকল্যাণমুখী ভিত্তি সম্প্রসারিত হতে পারেনি। ব্যালান্স শিট বলছে, যা বৃদ্ধি পেলে সকলের জন্যই মঙ্গল হতো, তা বৃদ্ধি পায়নি, হ্রাস পেয়েছে, আর যা হ্রাস পেলে ভাল হত, তা দ্রুতহারে বেড়েছে: গত তিন দশকে কিছু মানুষ অঢেল সম্পদের মালিক হয়েছেন আর ব্যাপক জনগোষ্ঠি নিঃস্ব হয়েছেন; সম্পদের উৎপাদনশীল বিনিয়োগ হয়নি, অনুপার্জিত আয় অধিক হারে অনুপার্জিত আয়ের উৎস খুঁজেছে; কিছু মানুষের জৌলুস বেড়েছে আর ব্যাপক জনগোষ্ঠির জন্য বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনা-দুর্দশা সম্প্রসারিত হয়েছে; উঠেছে বহুতল ভবন, বেড়েছে বস্তি। সরকারি প্রকৃত ব্যয় বরাদ্দ জনকল্যাণে কমেছে, বেড়েছে অনুৎপাদনশীল খাতে; বেড়েছে বৈদেশিক ঋণ-অনুদান, কমেছে দেশজ স্থানীয় উদ্যোগ; বেড়েছে অনুৎপাদনশীল খাতে সরকারি ব্যয়-বরাদ্দ, সেই সঙ্গে বেড়েছে পাবলিকের সঙ্গে পাবলিক সার্ভেন্টদের দূরত্ব; বেড়েছে নির্বাচনী ব্যয়, কমেছে সুশাসন আর নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা; বেড়েছে কালো টাকার দাপট, কমেছে জনগণের প্রতি রাজনীতিবিদদের মমত্ববোধ ইত্যাদি। তিন দশকের ব্যালান্স শিট সম্ভবত একটা সহজ সমীকরণ সমাধান

নির্দেশ করে। তা হ'ল জনকল্যাণবিমুখ যা কিছু বেড়েছে তা কিভাবে কমানো যাবে, আর জনকল্যাণমুখী যা কিছু কমেছে তা কিভাবে বাড়ানো যাবে। সমীকরণ সহজ হতে পারে তবে সমস্যার বিস্তৃতি ও গভীরতার বিচারে প্রকৃত সমাধান আদৌ সহজ নয়। সমস্যার আদর্শ সমাধান (ideal solution) হ'ল অকল্যাণ-নির্দেশক ক্রমবর্ধমান প্রবণতাসমূহ (ব্যালান্স শিটের বাম দিকের ১৭ গুচ্ছে বিবৃত) থেকে মুক্ত হওয়া আর কল্যাণ নির্দেশক ক্রমহ্রাসমান প্রবণতার গতিমুখ পরিবর্তন করা। ইতিহাসে আদর্শ সমাধান বলে সম্ভবত কিছু নেই, যা আছে তা হ'ল আদর্শ সমাধানের লক্ষ্যে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক উপযোগ সর্বোচ্চ করা। বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে রাজনৈতিক। এ প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট মুহূর্তে উপযোগ সর্বোচ্চ করণের মাত্রা কি হবে তা নির্ভর করছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জনগণের প্রস্তুতি ও রাজনৈতিক-সক্ষমতার উপর। দুদিক থেকেই প্রস্তুতির মাত্রা সমস্যার বিস্তৃতি ও গভীরতার তুলনায় সীমিত। বাংলাদেশ এখন এক ক্ষত-বিক্ষত সমাজ; জনকল্যাণমুখী রাজনৈতিক কাঠামো অতিমাত্রায় দুর্বল; স্ব-স্ব মতে আমরা অনড়; পারস্পরিক আস্থা-বিশ্বাস-সম্মানবোধ সন্দেহের ফাঁদে পড়ে অনৈক্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করছে; মধ্যবিত্তের মানসিক দারিদ্র প্রকট; বেকারত্ব-দারিদ্রের কারণে ছাত্র-যুব শক্তির কাছে নিকট ভবিষ্যৎ দূর ভবিষ্যতের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ; দরিদ্র জনগোষ্ঠির বিষয়টিও অনুরূপ–দীর্ঘমেয়াদের চেয়ে দৈনন্দিন দারিদ্র মোকবেলার বিষয়টি তাদের জন্য আশু; সুশীল সমাজ দ্বিধাবিভক্ত; দাতাগোষ্ঠি চতুর; আমলারা তাদের কাজে যথেষ্ট পারদর্শী; রাজনীতিতে বেঁচা-কেনা যথেষ্ট মাত্রায় সহজলভ্য; বাজার অন্ধত্ব জেঁকে বসেছে; বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া অনেক কিছু পাল্টে দিয়েছে; অভুক্ত মানুষের দেশের ভাল-মন্দ চিন্তার সময় কোথায়? এ মুহূর্তে এ কথা সত্য যে, এ দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠি মানসিকভাবে প্রস্তুত ও সন্তুষ্ট হবে যদি ব্যালান্স শিটের অকল্যাণকর সব কিছুর তীব্রতা সহনীয় মাত্রায় হ্রাস পায় (বিলুপ্ত নয়)। অর্থাৎ ঘুষ-দুর্নীতি-সন্ত্রাস নির্মূল নয় সহনীয় মাত্রায় স্থাপনও যথাযোগ্য হতে পারে। অর্থাৎ মধ্যপন্থার সমাধান গ্রহণযোগ্য হতে পারে, যা রাজনৈতিক ঐক্যমতের ভিত্তিতে সমাধানযোগ্য। এ মুহূর্তে সামাজিক কল্যাণ ফাংশন সর্বোচ্চকরণের এটাই একমাত্র কার্যকরী পন্থা বলে মনে হয়। এ ক্ষেত্রে ব্যপকভিত্তিক রাজনৈতিক সংলাপ ফলপ্রদ হতে পারে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ ব্যক্তি ও সংগঠনসমূহের ঐক্যভিত্তিক চেষ্টা জরুরি। সময় ক্ষেপণের সময় আর নেই।

সারণি ২: তিন দশকের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রবণতার ব্যালান্স-শিট

বৃদ্ধির প্রবণতা	হ্রাসের প্রবণতা
১. কালো অর্থনীতি/কালো টাকা এবং সংশ্লিষ্ট লুণ্ঠন, অপরাধ, সন্ত্রাস, অবৈধ অস্ত্র, পেশিশক্তি, দুর্নীতি, ঘুষ, হুণ্ডি, কুশাসন-অপশাসন, দমন-নিপীড়ন, খুন, জখম, রাহাজানি	শক্তিশালী অর্থনীতির ভিত; জাতীয় পুঁজির বিকাশ; শিল্পায়ন, সাধারণ মানুষের মানবিক জীবন পরিচালন-সক্ষমতা; কর্মসংস্থান; কালো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিরুৎসাহিত করার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকারিতা
২. কোটিপতি ও ভিক্ষুক/নিঃস্বায়িত মানুষ; জোরপূর্বক ভূমি-জলাশয় দখল; নতুন গাড়ী-ফ্লাট ও ভিক্ষাবৃত্তির নবতর কৌশল; যাকাতের কাপড় সংগ্রহে মৃতের সংখ্যা; শৈত্যপ্রবাহ ও গ্রীষ্মদাহে অসুস্থ ও মৃতের সংখ্যা	অর্থনৈতিক সুযোগ; কর্মসংস্থানের সুযোগ (মানব উন্নয়নের প্রথম শর্ত); সম্পদের প্রতি সাধারণ মানুষের অভিগম্যতা/ মালিকানা
৩. বহুতল ভবন; ইটভাটা; ইট-ভাঙ্গার মহিলা ও শিশু শ্রমিক	সাধারণ মানুষের বাসস্থান; পরিবেশের ভারসাম্য
৪. সুপার মার্কেট; গাড়ীর দোকান; গার্মেন্টস শিল্প, মহিলা শ্রমিক; পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা	শিল্প কারখানা; উৎপাদন সরঞ্জাম, কলকারখানা; কারখানার যন্ত্র আমদানি; শিল্প খাতে মূল্য সংযোজন
৫. গ্রাম থেকে শহরে আসা মানুষ; বস্তিবাসীর সংখ্যা; ইনফর্মাল সেক্টর; নিউক্লিয়ার পরিবার; শিশু-মহিলা ও প্রবীণদের দুর্দশা-বঞ্চনা	ভূমিহীনতা ও গ্রামে কর্মসংস্থান; প্রকৃত আয়/মজুরী; সম্প্রসারিত (বর্দ্ধিত) একান্নবর্তি পরিবার
৬. বৈধ-অবৈধ আমদানি ও রপ্তানি; অনুপার্জিত আয়; ভারসাম্যহীন অর্থনৈতিক উন্নয়ন	মানবশক্তি ও সম্পদের কার্যকর ব্যবহার; জাতীয় পুঁজির শিল্পখাতে বিকাশ; ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ
৭. বৈদেশিক ঋণ-অনুদান প্রকল্প; এনজিও কার্যক্রম	দেশজ ও স্থানীয় উদ্যোগ; স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারে প্রণোদনা ও আগ্রহ; সামাজিক ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ
৮. সার,কীট নাশক, উচ্চফলনশীল বীজ ব্যবহার ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসা, মজুতদারী-চোরাচালান	মাটির প্রাকৃতিক উর্বরতা; চিরাচরিত বীজ-ভাণ্ডার বৈচিত্র; বৃক্ষ, মাছ, পরিবেশের ভারসাম্য, কৃষিজ পণ্যের ন্যায্যমূল্য
৯. তথ্য প্রযুক্তির প্রসার ও যোগযোগ; কম্পিউটার ও ব্যবসা শাস্ত্রের ছাত্র সংখ্যা	সাধারণ বিজ্ঞান চর্চা; প্রযুক্তিগত ভিত্তি ; বিজ্ঞান-দর্শনের ছাত্র সংখ্যা
১০. নারীর কর্মসংস্থান ও সচলতা; নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা; নারী ও শিশু পাচার; এসিড নিক্ষেপ	নারীর প্রকৃত আয়/মজুরী; নারী ও শিশুর নিরাপত্তা; নারী ও শিশুর নিরাপত্তা-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা
১১. ব্যক্তিমালিকানাধীন বাণিজ্যিক-ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, কোচিং সেন্টার, ইংরেজি মাধ্যম স্কুল, কিন্ডার গার্টেন, মাদ্রাসা (ইংরেজি মিডিয়ামসহ); শিক্ষায় ধনী-দরিদ্র বৈষম্য	সাধারণ মানুষের জন্য সরকারি/বেসরকারি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়; শিক্ষার গুণগতমান; শিক্ষা ব্যবস্থার ফলপ্রদতা; মৌলিক শিক্ষাখাতে সরকারের প্রকৃত ব্যয়-বরাদ্দ
১২. ধর্ম ব্যবসা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, পীর-ফকিরের সংখ্যা, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি, ধর্মের নামে সহিংসতা, ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি বিতৃষ্ণার প্রকাশ ; ভাগ্য বিশ্বাস; জ্যোতিষির সংখ্যা	ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি সম-শ্রদ্ধাবোধ; বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান; বিজ্ঞান মনস্কতা; বিজ্ঞান চর্চা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান ভিত্তিক সাধারণ আলোচনাসভা; সুস্থ জীবনবোধ; ধর্মনিরপেক্ষ আচরণ ও মানস-কাঠামো
১৩. ব্যয়বহুল বেসরকারি ক্লিনিক, ডায়াগনোস্টিক সেন্টার; দুশ্চিন্তা ও দারিদ্র উদ্ভুত অসুখ-বিসুখ; চিকিৎসা ব্যয়; চিকিৎসা ব্যয়-উদ্ভুত নিঃস্বায়ন	প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার অবকাঠামো; সরকারি স্বাস্থ্য খাতে চিকিৎসার মান; স্বাস্থ্য খাতে মাথাপিছু প্রকৃত ব্যয়; সরকারি স্বাস্থ্য খাতের কার্যকারিতা
১৪. প্রতিরক্ষা, প্রশাসন, নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন অনুৎপাদনশীল খাতে সরকারি প্রকৃত ব্যয় বরাদ্দ; পাবলিকের সঙ্গে পাবলিক সার্ভেন্টদের দূরত্ব; বিচারের রায় প্রভাবিত করা	সুশাসন; ন্যায়বিচার; ব্যক্তিগত নিরাপত্তাবোধ; উৎপাদনশীল ও মানবকল্যাণমুখী খাতে সরকারি প্রকৃত ব্যয়-বরাদ্দ
১৫. নির্বাচনী বিনিয়োগ; কালোটাকার মালিক ও তাদের প্রতিনিধিদের নির্বাচনে পাল্লা দেওয়া; নির্বাচিত ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জনগণের দূরত্ব	নির্বাচিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা; নির্বাচিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি মানুষের আস্থা-বিশ্বাস
১৬. অপসংস্কৃতি চর্চা; অপ-সংস্কৃতি শ্রবণ-দর্শনে সময়ের অপচয়; মানুষে-মানুষে অবিশ্বাস	দেশজ সংস্কৃতির চর্চা; সংহতি বোধ; পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ; মানবিক মূল্যবোধ
১৭. রাজনৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়; রাজনীতিবিদদের দালালী; রাজনীতিকে ব্যবসায়ী পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা; স্বৈরশাসন; জনকল্যাণকামী ধারার রাজনৈতিক চেতনার চাহিদা	জনগণের প্রতি রাজনীতিবিদদের মমত্ববোধ; জ্ঞান ও আদর্শভিত্তিক রাজনীতি; রাজনীতিবিদদের দেশপ্রেম; গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ

উত্তরণের উপায়: প্রস্তাবনা

আমাদের সংবিধান বলছে “প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যাস্ত থাকিবে” (অনুচ্ছেদ ৭)। কিন্তু প্রজাতন্ত্রের মালিক ঐ জনগণ-এর অবস্থা যে মাত্রায় খারাপ তাতে তো বলতে হয় দুর্বৃত্তায়ন-সৃষ্ট বঞ্চনার ফাঁদ ছিন্ন না করে সমস্যার সমাধান হবে না। দুর্বৃত্ত তোষণ ও দারিদ্র লালন– উভয়ই এখন নিয়মে পরিণত হয়েছে।

সমস্যার সমাধানে জনকল্যাণকামী রাজনৈতিক আদর্শভিত্তিক নেতৃত্ব ও জনগণের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণের বিকল্প নেই ।

২০০৩ সালে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির লোকবৃক্ততায় নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ প্রফেসর জোসেফ স্টিগলিজ আমাদের উদ্দেশ্যে গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কিছু কথা বলে গেলেন, "এ দেশে দরিদ্রদের স্বার্থ নিয়ে লাগাতারভাবে বলে যাওয়া মানুষের সংখ্যা খুবই কম । আপনারা মানব দারিদ্র ও মানব বঞ্চনার বিরুদ্ধে নির্মোহ সত্য কথা বলতে থাকুন;--- সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নীতি কৌশল পরিবর্তনে সোচ্চার হোন । ... মনে রাখবেন বাজার অন্ধত্ব পরিহার না করলে খুব বেশি এগুনো যাবে না ।" আর আমাদের কাছের মানুষ, নোবেল বিজয়ী প্রফেসর অমর্ত্য সেন বললেন, "প্রকৃত উন্নয়নের ভিত্তি শক্তিশালী করতে হলে মানুষের চয়নের স্বাধীনতা প্রশস্ত করতে হবে । নিশ্চিত করতে হবে মানুষ যা হতে চায় তাই যেন সে হতে পারে; মানুষ যা করতে সক্ষম সেটাই যেন সে করতে পারে ।--- মানুষের সৃজন ক্ষমতা অসীম" । সুতরাং দেশের সত্যিকার উন্নতি বিধানে নিশ্চিত করতে হবে মানুষের পাঁচ ধরণের স্বাধীনতা, যার অন্তর্ভুক্ত অর্থনৈতিক সুযোগ, সামাজিক সুবিধাদি, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, স্বচ্ছতার গ্যারান্টি, ও সুরক্ষার নিশ্চয়তা । যে দেশে এসবের কোনোটিই নিম্ন মাত্রায় অর্জিত হয়নি, যে দেশের বিকাশে এসব স্বাধীনতার অনিশ্চয়তা বৃদ্ধির প্রবণতাটিই মূখ্য সে দেশের একজন সমাজ সচেতন মুক্তিকামী ব্যক্তির দায়িত্ব কর্তব্য কি হওয়া উচিত? নিঃসন্দেহে তা হতে হবে মানবকল্যণমুখী যার ফলে সংখ্যাগরিষ্ট দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক ও মানবিক দারিদ্র স্থায়ীভাবে দূর হতে পারে । তাও হতে হবে অতি দ্রুত । একদিকে বাজার-অন্ধত্ব পরিহার, আর অন্যদিকে বিপন্ন-বঞ্চিত মানুষকে উন্নয়নের কেন্দ্র বিন্দুতে প্রতিস্থাপন না করে তা অর্জন হবার নয় । মানবকল্যাণমুখী সৃজনশীল এ কর্মকাণ্ড অবশ্যই সম্ভব– সামনের ১০-১৫ বছরের মধ্যেই ।

আর্থ-রাজনৈতিক দুর্বৃত্তবেষ্টিত বাংলাদেশ এক অঢেল সম্ভাবনার দেশ । পৃথিবীর কোথাও রাজনীতিকরা এ সুবিধা পান না যে সাধারণ মানুষ দুটো মিষ্টি কথাতেই সন্তুষ্ট । এ দেশের মানুষের জীবন-চাহিদা অতি অল্প: ব্যপক জনগোষ্ঠি সম্ভবত দুবেলা দুমুঠো অন্নে সন্তুষ্ট; মানুষ একটু কর্মসংস্থান আর একটু শান্তি নিদ্রার চেয়ে বেশি আশা করে না; সরকারি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের একটু কার্যকারিতা বৃদ্ধির বেশি মানুষ চায় না । যে মানুষকে তিন দশক আগে প্রকৃত স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল সেই মানুষ দুর্বৃত্তায়নের আবর্তে আজ এত স্বল্পে সন্তুষ্ট হবে, তা রাজনীতিকদের জন্য বিশাল এক প্রাপ্তি । এ সুযোগ ও সম্ভাবনা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হলে ব্যর্থতার দায়ভার রাজনীতিকদের অন্য কারো নয় ।

বাংলাদেশের ১৪ কোটি মানুষের প্রত্যেককে যদি প্রশ্ন করা হয়– আজ থেকে এক পুরুষ আগে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে আকাঙ্ক্ষার বীজ রোপিত হয়েছিল, তা বাস্তবায়িত হয়েছে কি? সম্ভবত ১৩ কোটি ৯০ লাখ (ক্ষমতাহীন সংখ্যাগরিষ্ঠ) মানুষ বলবেন, "না, হয় নি"! যদি প্রশ্ন করা হয় কেন হলো না, সেক্ষেত্রে সম্ভাব্য উত্তরের ধাঁচ হতে পারে নিম্নরূপ(একাধিক উত্তর): জনগণের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি নেতৃত্বের commitment-এর অভাব, সীমাহীন দুর্নীতি, লুটপাট, স্ব-স্বার্থ ছাড়া অন্য সব কিছুকেই বিসর্জন দেওয়া, সহজে বড় লোক হওয়ার স্বপ্ন, ভাল-মন্দ আল্লাহর হাতে, যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ ইত্যাদি গোছের । আর যদি উত্তরের ধাঁচ থেকে মূল প্রবণতাসূচক উত্তরটি অনুসন্ধান করা হয়, সেক্ষেত্রে মানুষের প্রতি প্রকৃত ভালবাসার অভাব-উদ্ভূত উত্তরসমূহ প্রাধান্য পাবে । ক্ষমতাবান ১০ লাখ দুর্বৃত্ত কি করে ক্ষমতাহীন ১৩ কোটি ৯০ লাখ মানুষকে ভালবাসবেন– তা আমার অজানা । এ ধরণের শর্ত সৃষ্টি আদৌ সম্ভব কি? গত তিন দশকের বিকাশ বিশ্লেষণে এ ব্যাপারেও আমি সন্দিহান ।

গত তিন দশকে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক একটি বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়েছে যেখানে গুটি কয়েক ক্ষমতাধর মানুষ সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্রকে দুর্বৃত্তায়িত করেছেন । তারা সর্বশক্তিমান । তারা উল্টো পথের নিয়ামক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন । গণদারিদ্র তাদের জন্য আশীর্বাদ । অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ (ক্ষমতাহীন) মানুষ তিন দশকের অধিক কাল ধরে জীবনজীবিকা পরিচালনে যে-ভাবে নিরন্তর অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন সে জন্য

তাদের সাহস, ধৈর্য, নিষ্ঠা, সৃজন ক্ষমতা ও সততায় মুগ্ধ হতেই হয়। প্রশ্ন হ'ল স্বাধীনতা চেতনার সঙ্গে সাযুজ্যহীন অথবা বিপরীতধর্মী এই সমীকরণ কি চিরস্থায়ী হতে পারে? ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে এই বিশ্বাস জাগে যে, বিকাশ প্রবণতার চাকাটি এখন যে পথে ঘুরছে তা উল্টো দিকে ঘুরবে— তা-ই অনিবার্য। সমাজ রূপান্তরের এ বিষয়টি নিঃসন্দেহে বড় মাপের রাজনৈতিক পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট। তা কবে, কখন, কিভাবে ঘটবে, তা-ই দেখার বিষয়। সম্ভবত সামনে রয়েছে আরও একটা সংগ্রাম প্রক্রিয়া— যা নিশ্চিত করবে জনকল্যাণমুখী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, যেটা ছিল স্বাধীনতার মূল আকাঙ্ক্ষার মর্মবস্তু। অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন-এর ফাঁদ থেকে উত্তরণ ব্যতীত মহাবিপর্যয় রোধের উপায় নেই। বিলম্ব অধিকতর বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। জনকল্যাণমুখী এই উত্তরণের প্রধান পূর্বশর্ত এক ধরণের রাজনৈতিক পরিবর্তন নিশ্চিত করা, যে পরিবর্তনে সম্মিলন ঘটাতে হবে উষ্ণ হৃদয়, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সাহসী দেশপ্রেমিক নেতৃত্বের সঙ্গে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ (substantive public actions)। এ ধরনের রাজনৈতিক-সামাজিক রূপান্তরই টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া ও মানবকল্যাণমুখী অর্থনীতির ভিত্তি বিনির্মাণ করতে সক্ষম।

সমগ্র বিষয়টি যে শুধুমাত্র রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধ, তাও ঠিক নয় বলে মনে করি। উত্তরণে জ্ঞান-ভিত্তিক যে কর্মকাণ্ড প্রয়োজন, সেখানে আছে বিরাট দুর্বলতা। আসলে বিশ্ব নিয়ত পরিবর্তীত হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সংকট পরবর্তী বিশ্ব আগের তুলনায় ভিন্ন, একমেরুকৃত। বিশ্বায়ন বিশ্বকে পাল্টাচ্ছে। ওলট-পালট হচ্ছে। আমরা পাল্টাচ্ছি। পাল্টাচ্ছে নেতা, আমলা, ব্যবসায়ী, কালো টাকার মালিক। সাধারণ মানুষও আগের মত নেই। ১১ সেপ্টেম্বর পরবর্তী বিশ্ব অতীতের তুলনায় ভিন্ন। একমেরুর বিশ্ব দখল করতে চায় অন্য সকলের সম্পদ ও বাজার। ধরা যাক যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে যুদ্ধ শুরু করলো। বিশ্ব আরও নতুন রূপ নেবে। কেমন হবে সে বিশ্ব আর সে বিশ্বে বাংলাদেশে আমাদের ভূমিকা ও উন্নয়ন কৌশল কি হবে? ধরা যাক আগামী কাল বর্গি-ফিরিঙ্গি-ডোনাররা এক যোগে প্লেনে উঠে এদেশ ছেড়ে দিল। ধরা যাক, আমাদের সব কিছুতেই পরামর্শ দেওয়া যাদের অভ্যাস অথচ যাদের আমরা পছন্দ করি না, তারা আর নেই। আমরা কি করবো? আমাদের নিজেদের চালানোর যোগ্যতা ও প্রস্তুতি কতটুকু? আমার ধারণা জটিল সমীকরণের এসব বিষয় চিন্তা ও বিশ্লেষণে আমাদের পূর্ণ মাত্রায় গলদ আছে। আমরা পরিবর্তন, রূপান্তর-এর যে কথা বলছি, তার কৌশল কি হবে? সম্ভবত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে Paradigm shift প্রয়োজন। সম্ভবত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমাদের inherent অক্ষমতা ও চিন্তার দৈন্য আছে। অর্থনীতি সমিতিসহ সমাজ গবেষকদের অনেকেই এ বিষয়ে অগ্রণী হতে পারে। তবে ঐ shift নিশ্চিত করার প্রথম ও প্রধান শর্ত হবে সত্যকে নির্মোহভাবে আলিঙ্গন করার যোগ্যতা অর্জন। আশার কথা, এ দেশের সচেতন মধ্যবিত্ত সমাজে এক ধরণের আত্মানুসন্ধানের ধারা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সেখানেও রয়েছে আত্মপ্রবঞ্চনা, ছলনা, দোদুল্যমানতা, সত্যানুসন্ধানে বস্তুনিষ্ঠতার অভাব, বৈপরীত্য, বিচ্যুতি। তবে নির্মোহ সত্যানুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষা কম হলেও আছে। এ অনুসন্ধান প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে নতুন জ্ঞান-ভিত্তি সৃষ্টি হবে। যে ভিত্তিতে গভীর মূল্যায়ন ভিত্তিক চয়নের স্বাধীনতার পথ ও পদ্ধতি আবিষ্কৃত হবে। সুতরাং নির্মোহ সত্য অনুসন্ধানের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে হবে। আর সেই আবিষ্কৃত সত্য যত রূঢ়ই হোক, তাকে গ্রহণ করার মানসিক কাঠামো সৃষ্টি করতে হবে। দুই-ই নিঃসন্দেহে একটা বড় মাপের কাজ। মনে রাখতে হবে যে আজকের বাংলাদেশের ৮০ শতাংশ মানুষ ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ দেখেননি; আর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত হয়েছে যথেচ্ছ। বিভিন্ন কারণে উগ্র ধর্মান্ধতা বৃদ্ধি পাচ্ছে; আর স্বাধীনতাকামী মানুষের নেতৃত্ব ঐক্যবদ্ধ নয়। আসলে জনগণের অপার শক্তির প্রতি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে রূপান্তর প্রয়োজন। দারিদ্রমুক্ত ও সমতাভিত্তিক একটি মানবিক বাংলাদেশ গঠনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অন্তর্নিহিত শক্তির বিকল্প আছে কি?

আবারও সারকথা বলি: গভীর এক আত্মঘাতী অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের কবলে পড়েছে বাংলাদেশ। দুর্বৃত্ততোষণ ও দারিদ্র লালন এখন নিয়মে রূপান্তরিত হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী গত তিন দশকে একই বাংলাদেশে দুই অর্থনীতি ও দুই সমাজের মেরুকরণ স্পষ্টতর হয়েছে; বছরে ৭০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ কালো টাকা সৃষ্টি হচ্ছে, প্রবণতা ঊর্ধ্বমুখী; কৃষির ভিক্ষুকায়ন ত্বরান্বিত হয়েছে; ঢাকা শহরের

রিকসা-ভ্যান-ঠেলাগাড়ী উচ্ছেদ কৃষিসহ সমগ্র সমাজের ভিক্ষুকায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করবে; শিল্পায়ন সম্ভাবনা হ্রাসের প্রবণতা বহাল আছে; অনুৎপাদনশীল খাত আর নিকৃষ্ট পুঁজির দৌরাত্ম বৃদ্ধি পেয়েছে; দেশজ পুঁজি শিল্পে বিনিয়োগে অনুৎসাহি, বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিত হবার কারণ নেই; জাতীয় সম্পদ ও জাতীয় আয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র-বঞ্চিত মানুষের হিস্যা কমেছে; দরিদ্র জনগোষ্ঠির বিশেষত নারীদের প্রকৃত ক্ষমতায়ন গতিহীন; বয়োবৃদ্ধ জনগোষ্ঠির নিঃসঙ্গতা ও অসহায়ত্ব ক্রমবর্ধমান; ব্যাংক-বীমা-মূলধন বাজার উন্নয়ন-সহযোগী ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে; কর্মসংকোচন ক্রমবর্ধমান; নূতন কর্মসংস্থান হচ্ছে না; যুব দারিদ্র ক্রমাগত বাড়ছে; বৈদেশিক ঋণ-অনুদান লুটপাটের অবস্থা-ব্যবস্থা আগের মতই আছে; সরকারি ব্যয় বরাদ্দে মানব কল্যাণ অগ্রাধিকার বিবেচনা নেই বললেই চলে; রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যালান্স-শিটে জনকল্যাণবিমুখ প্রবণতার কোনো পরিবর্তন নেই, লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন-সৃষ্ট বঞ্চনার ফাঁদ ছিন্ন না করে পরিত্রাণের পথ নেই। রাষ্ট্র পরিচালনে প্রয়োজন জনকল্যাণকামী রাজনৈতিক আদর্শভিত্তিক নেতৃত্ব ও জনগণের স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ। গ্রহণযোগ্য অন্য কোনো বিকল্প প্রস্তাবনা থাকলে বিবেচনা করা যেতে পারে।